অর্ধেক মানবী

নীললোহিত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৯

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ডি. বি. প্রিন্টার্স, ৪ কৈলাস মুখার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে রাধাবল্লভ মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত

অর্ধেক মানবী
নীলা

নীললোহিতের অন্যান্য গ্রন্থ

সুদূর ঝর্ণার জলে

স্বর্গের খুব কাছে

ছবিঘরে অন্ধকার

আমার এক টুকরো পৃথিবী

তোমার তুলনা তুমি

তিন সমুদ্র সাতাশ নদী

ভালবাসা নাও, হারিয়ে যেও না

ঘটনার ঘনঘটা

নিরুদ্দেশের দেশে

নীলার মত একটি মেয়ে আমার কাছে স্বেচ্ছায় আসে, আমার দুঃখের ভাগ সে নিতে চায়, অপমানের সময় সে সান্ত্বনা দেয়, এরকম সৌভাগ্য কজনের হয়? আবার সে কোথায় থাকে তা জানি না, ইচ্ছে করলেও আমি তার সঙ্গে যেতে পারি না, এও যে চরম কষ্টকর।

... ...

নীলা কি কল্প-বিজ্ঞানের নায়িকা? কিন্তু তাদের তো পাহাড়ের উপত্যকায় কিংবা খুব নির্জন কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

... ...

নীলা থাকে দিক্‌শূন্যপুরে। নীললোহিত শেষ পর্যন্ত যাবে সেখানে। কিন্তু কি দেখবে সেখানে?

অর্ধেক মানবী

সিঙ্গাপুর থেকে হঠাৎ মেজমামা এসে আমার মহা সর্বনাশ করে দিলেন।

এই মেজমামাটি দু'তিন বছর অন্তর অন্তর একবার করে দেশে আসেন, আমাদের বাড়িতে কখনো এক রাতের বেশি থাকেন না, তারপরেই চলে যান মুর্শিদাবাদের কান্দীতে ওঁর শ্বশুরবাড়িতে। সেখান থেকে আবার বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে। সিঙ্গাপুর নাকি খটখটে, ঝকঝকে, খুব যান্ত্রিক শহর, তাই দেশে ছুটি কাটাতে এসে মেজমামার কোনো শহরে থাকতে ভালো লাগে না। উনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, মেঠো রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটেন, এঁদো পুকুরে সাঁতার কাটেন। মুড়ি-চিঁড়ে-খই আর নারকোল নাড়ু ওঁর প্রিয় জলখাবার।

মেজমামা এলে আমরা কিছু বিদেশী চকলেট আর নানারকমের ডটপেন উপহার পাই। একবার উনি আমার জন্য একটা চক্রাবক্রা জামাও এনেছিলেন, তাতে ড্রাগন আঁকা। মা সে জামাটা আমায় কিছুতেই পরতে দেননি. সেটি আমাদের বাড়ির জমাদারকে পুজোর জামার বদলে গছানো হয়েছে। একবার মেজমামা আমাকে একটা ক্যামেরাও দিতে চেয়েছিলেন, সেটা অবশ্য আমি নিইনি। মেজমামার শালা ভন্তুর ওপর কোনো কারণে আমার রাগ ছিল, তাই আমি মিষ্টি হেসে বলেছিলুম, মেজমামা, তুমি ঐ ভালো জিনিসটা ভন্তুকেই দাও! ঐ ক্যামেরার জন্য ভন্তুর এখন প্রতি মাসে অন্তত দুশো টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে একবার ওটা সারাতেও হয়েছে।

এবারে মেজমামার মাথায় কী এক দুষ্টুবুদ্ধি চাপলো, উনি এক বর্ষার সন্ধেবেলা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মাকে বললেন, ছোড়দি, তোমার এখানে আমি দিন সাতেক থেকে যাবো!

ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে খুব, অনেক রাস্তায় জল জমে আছে। চারদিকে ছুটি ছুটি ভাব. আমরা প্রত্যেক দুপুরে খিচুড়ি খাচ্ছি। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে মেজমামাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। মওকা পেয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার দেড়শো টাকা চেয়েছিল, তাও বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ট্রিভোলি

কোর্টের কাছে ইঞ্জিন থেমে গেল। তখন সেই রাস্তার কোমরজলে নেমে গাড়ি ঠেলতে হয়েছে মেজমামাকে। তার ওপরে আবার একটা ড্রেনের মধ্যে পা ঢুকে গিয়েছিল। মেজমামার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে পা-টা ফ্র্যাকচার হয়নি, শুধু গোড়ালির কাছে একটু মচকেছে।

এতেও অবশ্য মেজমামার মেজাজ খারাপ হয়নি। তিনি সদা হাস্যময় ধরনের মানুষ। রাস্তায় ঠেলতে হয়েছে বলে তিনি ট্যাক্সিওয়ালাকে হিসেব করে দেড়শো টাকা থেকে আঠারো টাকা কম দিলেন। কী হিসেব তা কে জানে, ট্যাক্সিওয়ালাও আপত্তি করলো না। মচকানো পা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উৎফুল্ল গলায় মেজমামা বললেন, আরে, প্রত্যেকবার আমি এসেই গ্রামে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠি কেন? কলকাতাটাও যে এখনো গ্রাম হয়ে আছে, সেটা খেয়ালই করিনি। আসবার পথে কী দেখলুম জানিস? ল্যান্সডাউন আর সার্কুলার রোডের ক্রসিং-এর কাছে কী একটা পার্ক আছে, সেই পার্কের পুকুরটা উপচে রাস্তার জলের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। পুকুরের মাছও ভেসে যাচ্ছে, একদল ছেলে গামছা দিয়ে সেই মাছ ধরছে! সার্কুলার রোডে মাছ ধরা! আর এক জায়গায় দেখি, খাটাল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো মোষ, তারা গাঁক গাঁক করে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে মাঝরাস্তা দিয়ে, আর রাস্তার লোকজন ভয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে, রানিং হেলটার স্কেলটার যাকে বলে! আজকাল গ্রামেও চট করে এরকম দৃশ্য দেখা যায় না।

মেজমামার সুটকেস আর ব্যাগ-ট্যাগ আমি বয়ে আনলুম ওপরে।

মাকে প্রণাম করে মেজমামা বললেন, তুমি বেশ রোগা হয়ে গেছো, ছোড়দি। ছেলেরা তোমাকে ভালো করে খেতে দেয় না বুঝি?

মা হেসে বললেন, এসেই কী সব অলক্ষুণে কথা শুরু করলি! খেতে দেবে না কেন? মোটেই আমি রোগা হইনি, তুই-ই বরং…। তুই এবার অনেকদিন পর এলি, পিণ্টু! অন্যান্যবার শীতকালে আসিস, এবার এই বর্ষার মধ্যে…

মেজমামা বললেন, ভালোই তো হলো, এবার বর্ষাটা দেখা যাবে। অনেক বছর দেশের বর্ষা দেখিনি।

—উষা আর ছেলেমেয়েরা এলো না?

—নাঃ! মেয়েটার সামনেই পরীক্ষা। উষার ধারণা, সে কাছে না থাকলে মেয়েটা ফেল করবে! এদিকে উষার নিজের বিদ্যের দৌড় কতখানি তা তো তুমি জানোই! ইংলিশ অনার্সে গাড্ডু মেরেছিল।

—বাজে কথা বলিস না। তুই তো ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর দিকে কোনো নজরই দিস না। উষাই সব দেখাশুনো করে শুনেছি।

—আমার বাবা-মা কি পরীক্ষার আগে আমার পড়া দেখিয়ে দিত? আমরা নিজে নিজে পড়ে পাশ করিনি? উষার যত সব আদিখ্যেতা। বললুম, ছেলে-মেয়েদের রেখে আমার সঙ্গে চলে আসতে। তোমাকে এই বলে রাখলুম ছোড়দি, মিলিয়ে দেখো, অতিরিক্ত আদর পেয়ে পেয়ে আমার ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে যাবে। কিস্যু হবে না ওদের। আমার ছোট ছেলেটা ডিমসেদ্ধ খেতে চাইতো না, বুঝলে, নিয়ে নষ্ট করতো। আমার কত কষ্টের রোজগার করা পয়সা। একদিন ওর মা বাড়ি ছিল না। আমি ছোট ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে বললুম, হারামজাদা, শুয়ারকা বাচ্চা, ডিম নষ্ট করবি তো এইসান একখানা রদ্দা কষাবো যে ঘাড় ভেঙে যাবে। মায়ের কাছে নালিশ করলে জিভ কেটে দেবো! ব্যাস, তারপর থেকে সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন ডিম চেয়ে খায়। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খায়!

আমরা হাসতে লাগলুম। মেজমামার কথাবার্তার মধ্যে সত্যি মিথ্যে ধরা শক্ত। তবে মেজমামা এলেই বাড়িটা সরগরম হয়ে ওঠে।

বাড়িতে কোনো অতিথি এলেই আমার ভালো লাগে। যেন এক ঝলক নতুন গন্ধবহ বাতাস। অতিথির সামনে আমরাও একটু বদলে যাই। অন্য সুরে কথা বলি। মেজমামা ছ'ফুটের বেশি লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দশাসই শরীর। দেখলেই মনে হয় অফুরন্ত তাঁর প্রাণশক্তি। মিলিটারিদের মতন কাঁধের দু'পাশে ফ্ল্যাপ দেওয়া শার্ট পরেন। তাঁর হাসির শব্দ দেয়াল ফাটাবার মতন।

চা-জলখাবার খেতে খেতে মেজমামা গল্পের বন্যা বইয়ে দিলেন।

মেজমামা ভন্তুকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে যান। ভন্তু থাকে শ্যামবাজারে। নর্থ ক্যালকাটায় নাকি এবার অসম্ভব জল জমেছে। ট্রাম-বাস কিচ্ছু যাচ্ছে না, দু'তিনদিনের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হবার আশা নেই, বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

একসময় গল্প থামিয়ে মেজমামা বললেন, তা হলে ভন্তুকে একটা টেলিফোন করে দিই। এবার দু'চারদিন পরেই গ্রামে যাবো। ফোনটা কোথায়? ওকি, ফোনটাকে টেবিলের নীচে রেখেছিস কেন?

আমি বললুম, এক মাস ধরে ফোনটা কোনো শব্দ করে না!

মেজমামা সবিস্ময়ে এ-ক-মা-স বলতেই আমি আবার জানালুম, অত অবাক হচ্ছো কেন? অনেকের ফোন তিনমাস-ছ'মাসও খারাপ থাকে, আমাদের তো মোটে এক মাস হয়েছে।

মেজমামা বললেন, রাস্তায় কোমরজল, সাউথ থেকে নর্থ ক্যালকাটায় য়াবার কোনো উপায় নেই। টেলিফোনেও খবর দেওয়া যাবে না। বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা! লোকে অফিস-টফিসেও যাচ্ছে না বোধহয়? কী রে, নীলু, তুই আজ অফিস গেস্‌লি? নাকি ইস্কুলের মতন রেইনি ডে?

মা বললেন, নীলুর আবার অফিস কোথায়?

মেজমামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর অফিস নেই···মানে, তুই চাকরি টাকরি করিস না এখনো?

আমি হাসিমুখে দু'দিকে ঘাড় নাড়লুম।

মেজমামা আমার পিঠে একখানা বিরাট চাপড় মেরে বললেন, বা-বা-বা-বা-বা! এ তো অতি দিব্য ব্যাপার! নীলু, তুই তা হলে খাসা আছিস বল! আগের জন্মে যারা চরম পাপ করেছে, তারাই তো এ জন্মে চাকরি করে! তুই তো মহাপুরুষ!

আমার পিঠে চাপড়ের শব্দটা শুনে টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়ানো বৌদি চমকে উঠে বললো, উফ! মেজমামা, আপনার আদরটাও তো সাজ্ঘাতিক!

মেজমামা বললেন, সাড়ে তিন বছর পরে দেশে ফিরলুম। এখানে প্রাণখুলে কথা বলা যায়। তোমরা বেশ মজায় আছো। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, টেলিফোন কাজ করে না, বাড়িতে একটা দামড়া ছেলে বেকার বসে থাকে, তবু তো সব ঠিকঠাক চলছে! কোনো অসুবিধে নেই। আর আমাদের ওখানে পান থেকে চুন খসার উপায়টি নেই, সারা সপ্তাহ খাটতে খাটতে জিভ বেরিয়ে যায়, কেউ একটু হাসি-ঠাট্টা করারও সময় পায় না। এমনভাবে রোজগার করেই বা কী লাভ!

মা বললেন, পিন্টু, তোর পা মচকে গেছে, একটু চুন-হলুদ লাগিয়ে দি? নাকি আয়োডেক্স-ফায়োডেক্স কিছু মাখবি?

মেজমামা বললেন, দাঁড়াও ছোড়দি, আগে চানটা করে আসি। রাস্তার নোংরা জলে নেমে গাড়ি ঠেলতে হয়েছে তো, গা-টা এখন কিটকিট করছে। ওষুধ-ফষুধ কিচ্ছু লাগবে না।

—তা হলে গরম জল করে দিক!

—আরে নাঃ। দেশে ফিরে আমি কক্ষনো গরম জলে স্নান করি না। তোমার গামছা আছে? তোয়ালে দিয়ে গা মুছে মুছে অভক্তি জন্মে গেছে। গামছার মতন মোলায়েম জিনিস আর হয় না।

মেজমামা বাথরুমে ঢুকে যাবার পর মা আমার দিকে তাকিয়ে একটা চোখের ইঙ্গিত করলেন।

দাদা অফিসের কাজে পাটনা গেছে। বাড়িতে মা, বৌদি আর আমি এই তিনটি প্রাণী। বাদলার মধ্যে আজ আর বাজারে যাওয়ার ঝামেলা করিনি। দুপুরে খিচুড়ি-আলুসেদ্ধ-ওমলেট খাওয়া হয়েছে, রাত্তিরেও ডিমের ঝোল দিয়ে চালিয়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু মেজমামাকে কিছু স্পেশাল খাতির দেখানো দরকার।

যতই বৃষ্টি হোক, গড়িয়াহাটের বাজার সন্ধের পরেও খোলা থাকে। এবারের বর্ষায় বেশ ভালো ইলিশ উঠেছে। মেজমামা এখানকার মাছ খেতে খুব ভালো-বাসেন। সিঙ্গাপুরে শুধু সামুদ্রিক মাছ, সেসব তাঁর পছন্দ নয়। ভক্তুর কাছে গল্প শুনেছি, কান্দীতে একবার পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছিল, একটা প্রায় তিন কিলো ওজনের রুইমাছ উঠলো, পাড়ে ফেলার পরও সেটা লাফাচ্ছে। মেজমামা সেই মাছটা জড়িয়ে ধরে আনন্দের চোটে প্রায় কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, ওরে, সিঙ্গাপুরে এক লাখ টাকা দিলেও এমন টাটকা পুকুরের মাছ পাওয়া যাবে না!

বিদেশে মেজমামার প্রায় কুড়ি বাইশ বছর কেটে গেল, তবু তাঁর দিশি রুচি এখনো বদলায়নি।

মাসের শেষ, তবু বৌদি কী করে যেন ম্যাজিকের মতন একটা একশো টাকার নোট বার করে দিল। মা বললেন, একটু ভালো দেখে চালও আনিস, আর কাঁচা লঙ্কা, আর গোটাছয়েক সন্দেশ, সাইজটা যেন একটু বড় হয়···

প্যান্ট গুটিয়ে, ছাতা আর থলে হাতে নিয়ে আমি বাজারে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা দিয়েছি, এমন সময় বাথরুম থেকে মেজমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে কী হলো! ভুল করে কে আলো নিভিয়ে দিল রে? আমি যে ভেতরে আছি!

আমি বললুম, লোডশেডিং!

মা বললেন, এই রে, অন্ধকারের মধ্যে ছেলেটা আবার ঠোক্কর খাবে। তুই চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাক পিন্টু, মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছি। অলকা, তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি।

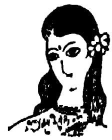
বৌদি বললো, যাঃ, মোম যে ফুরিয়ে গেছে। নীলু, তুমি আগে চট করে মোম কিনে দিয়ে যাও তো। ততক্ষণ একটা টর্চ দেবো?

মেজমামা বললেন, লাগবে না, লাগবে না! এ যে চমৎকার ব্যাপার! গ্রামে তবু কাছাকাছি হ্যারিকেন বা লণ্ঠনের আলো-টালো দেখা যায়। এমন নিশ্ছিদ্র

অন্ধকার বহুকাল দেখিনি ! বা-বা-বা-বা-বা-বা-বা ! হে-হে-হে হে-হে-হে-হে !

আমার মনে হলো আনন্দের চোটে বাথরুমের মধ্যে পিণ্টুমামা নাচতে শুরু করেছেন। দেশে ফিরে সব কিছুতেই মজা পাচ্ছেন উনি। এই সব সময়ে বোঝা যায়, আনন্দ বা দুঃখ, বিরক্তি বা মজা, এই সব ব্যাপারগুলিও কত আপেক্ষিক। আলো-ঝলমল দেশগুলো থেকে যারা আসে, তাদের কিছুটা অন্যরকম স্বাদ দেবার জন্যই কলকাতায় এরকম অন্ধকারের ব্যবস্থা।





সর্ষেবাটা দিয়ে ঝোলের ইলিশ চারখানা খেয়ে ফেললেন মেজমামা, তার আগে দু'খানা ভাজা।

বৌদি জিজ্ঞেস করলো, আর একটা মাছ দিই ?

মা বললেন, না, না. আর দিও না ! প্রথম দিন এসেই এতগুলো ইলিশ খেয়ে ও হজম করতে পারবে না।

মেজমামা বললেন, আর একখানা ডিমভরা পেটি দাও, অলকা ! ব্যাস ! চেহারাখানা দেখছো তো ছোড়দি, সব হজম করতে পারি। লোকে ক্যাভিয়ার ক্যাভিয়ার করে ! আগুন দাম দিয়ে ঐ মাছের ডিম কেনে। কিন্তু মাছের ডিম না ঘোড়ার ডিম ! ঐ ক্যাভিয়ারের তুলনায় ইলিশ মাছের ডিম আমার দশগুণ বেশি ভালো মনে হয় !

মা বললেন, ডিম থাকলে ইলিশের স্বাদ কমে যায়। নীলু মাছটা ঠিক চিনতে পারেনি।

মেজমামা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, খুব ভালো স্বাদ। ইলিশের ডিম হলো উপরি লাভ। ডিম ছাড়া ফাঁকা পেটির মাছ আমার তেমন ভালো লাগে না। খুব ভালো কিনেছিস রে, নীলু ! কত করে নিল রে ?

—পঞ্চাশ টাকা করে নিলো। মাছটা দেড় কিলোর একটু বেশি, আমার সঙ্গে চেনা আছে বলে আমার কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকাই নিয়েছে।

—অর্থাৎ ?

আমি বুঝতে না পেরে মেজমামার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

উনি হেসে বললেন, আসল দামটা কত ? এ বিষয়ে সোজা একটা থিয়োরি ছিল আমাদের টাইমে। কোনো বেকার ছেলে যদি বাজার করতে যায়, সে বাড়িতে এসে মাছের দাম বাড়িয়ে বলে। কারণ ওর থেকে তাকে টু পাইস সরাতে হয়। আর কোনো চাকরিওয়ালা লোক যখন নিজের টাকায় বাজার করতে যায়, সে ফিরে এসে সব জিনিসের দাম একটু একটু কমিয়ে বলে। তাতে তার দরাদরির

কৃতিত্ব দেখানো হয়। তুই বাজার থেকে কত মেরেছিস সেটা আমি জানতে চাইছি না, এখন ইলিশের আসল দর কী রকম, সেটা জানতে চাই।

—ঠিক দামই বলেছি, মেজমামা। আমার ওরকমভাবে পয়সা মারার দরকার হয় না।

—তা হলে তোর হাত-খরচ-টরচ চলে কী করে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই মায়ের দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে মেজ-মামা আবার বললেন, আর বেশি দিন তোমাকে বেকার থাকতে দেওয়া হবে না হে, নীলুচন্দর! এবার তোমাকে একটা চাকরি করতেই হচ্ছে!

বুঝলুম যে আমার অনুপস্থিতিতে মায়ের সঙ্গে মেজমামার অন্যরকম পাঁচ কথা হয়েছে। উনি মত বদলে ফেলেছেন আমার সম্পর্কে। আমিও মায়ের দিকে কটমট করে তাকালুম।

মেজমামা বললেন, আমি চাকরি করি, তোর দাদা চাকরি করে, ভক্ত চাকরি করে, চেনাশুনো সবাই চাকরি করে, এমন কি অলকাও একটা স্কুলে পড়ায়, শুধু তুই একা বেকার থাকবি কেন? এটা তো স্বার্থপরতা! আমরা খেটে খেটে মুখের রক্ত তুলবো, আর তুই দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবি, তা কেন চলবে? সে সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে না শয়তান! এটা সিরাজউদ্দৌলা নাটকে মহম্মদী বেগের ডায়ালগ না?

মা বললেন, চাকরি করতে চাইলেও তো পাওয়া যায় না। যা দিনকাল পড়েছে!

মেজমামা বললেন, এবার দ্যাখোই না! আমি সাতদিনের মধ্যে নীলুর জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিচ্ছি!

বৌদি বললো, অত সহজ নয়, মেজমামা। সারা দেশে কোটি কোটি বেকার। শুধু পশ্চিম বাংলাতেই শিক্ষিত বেকার চল্লিশ না পঁয়তাল্লিশ লাখ!

মেজমামা বললেন, তা হোক না চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লাখ। তারা কেউ আমার ভাগ্নে নয়!

বৌদি হেসে বললো, ঐ সব বেকার ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই কারুর না কারুর ভাগ্নে-ভাগ্নী!

মেজমামাও হেসে বললেন, কিন্তু তাদের কারুর মামার নাম কি পিনাকপানি ব্যানার্জি? আমি চেষ্টা করলে আমার ভাগ্নের একটা চাকরি হবে না, এটা অসম্ভব! আগে শোনা যাক, নীলু নিজে কী কী চেষ্টা করেছে। কী রে, নীলু, চুপ করে

আছিস কেন ? এ পর্যন্ত কটা ইণ্টারভিউ দিয়ে ফেইল করেছিস ?

আমি বললুম, মেজমামা, আমার কেসটা একটু আলাদা। এ দেশে আমি ব্যতিক্রম। আমি চেষ্টা করে চাকরি পাইনি তা নয়। আমি চাকরির জন্য কোনো চেষ্টাই করি না !

—ওবে বাবা, সেটা খুব অহঙ্কারের ব্যাপার নাকি ? কেন, চেষ্টা করিসনি কেন ?

—কারণ, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লাখ বেকারের ভিড়ের মধ্যে মিশে, অন্যদের সঙ্গে ল্যাং-মারামারি করে কোনোক্রমে একটা চাকরি জোগাড় করা আমাব ধাতে পোষাবে না। তার বদলে আমি বেশ আছি।

—এবকম বেশ থাকা কত দিন চলবে, সোনামনি ? এখন তো দাদার সংসাবে দু'বেলা খ্যাট জুটে যাচ্ছে। মা বেঁচে অ ছে বলে বৌদি মুখঝামটা দিচ্ছে না। ছোড়দি যেদিন চোখ বুঁজবে, সেদিন এই দাদা-বৌদিই অন্য রূপ ধারণ করবে, বুঝলি ? সেদিন দেখবি, তোর ভাতেব থালার এক পাশে একটু ছাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোকে প্রথম ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, মানে মানে কেটে পড়ো ! কী অলকা, আমি ভুল বলছি ?

বৌদি বললো, আজকাল গ্যাসে রান্না হয়। ছাই জোগাড় কবা খুব শক্ত !

মা বললেন, নীলুকে আমি কতবার বলি···

মাকে বাধা দিয়ে বৌদি বললো, না, সিরিয়াসলি, মেজমামা, পৃথিবীতে সবাইকেই যে চাকরি করতে হবে, এটা আমি মোটেই সাপোর্ট করি না। ফ্যামিলিতে কেউ একজন বাঁশি বাজাবে কিংবা ছবি আঁকবে কিংবা কবিতা লিখবে, কিংবা এসব গুণ না থাকলেও বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াবে, না হলে পৃথিবীটা কালারফুল থাকবে কী করে ? সবাই কেজো, সংসারী, প্র্যাকটিক্যাল হলে পৃথিবীটা ডাল্ হয়ে যাবে না ? নীলু যে টো টো করে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, টাকা-পয়সার চিন্তা করে না, ও সেইভাবেই থাক না !

আমি মেজমামার দিকে চেয়ে বললুম, দেখলে, বৌদি আমার কত বড় সাপোর্টার ? সেই জন্যই তো আমি এত মজায় আছি !

মেজমামা ঠোঁট উল্টে বললেন, অলকার এত সব রোমাণ্টিক ধারণা কত দিন টিকবে ? এখন ওর নতুন বিয়ে হয়েছে, স্বামী ভালো চাকরি করে, সেই জন্য ফুর-ফুরে মেজাজে আছে। এর পর যখন ওদের এণ্ডিগেণ্ডি হবে, খরচ বাড়বে, টানাটানি দেখা দেবে সংসারে, তখন এইসব ভালো ভালো চিন্তা কর্পূরের মতন উবে যাবে। তখন দেখবি, এই অলকাই স্বামীর সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে মুখ-ঝামটা

দিয়ে বলবে, তোমার ঐ অপোগণ্ড ভাইটা কত দিন বসে বসে গিলবে? ওকে দিয়ে সংসারের কোনো সাশ্রয় হয় না, বরং জামাকাপড়ের বাবুয়ানি আছে। ওকে বিশ্বাস করে বাজারেও পাঠানো যায় না। এক প্যাকেট মোমবাতি কিনতে দিলেও তার থেকে পয়সা সরায়। তোমার প্যাকেট থেকে সিগারেট চুরি করে। আরও কত কি চুরি করে কে জানে! ওকে বলো না, বালিগঞ্জ স্টেশনে ভাঁড়ের চা বিক্রি করতে, তাতেও তো দু পয়সা আসবে!

মেজমামা বৌদির গলা বেশ ভালোই নকল করে যাচ্ছেন। বৌদি হাসতে হাসতে নুয়ে পড়লো।

মা বললেন, না, না, অলকা কোনোদিনও···আমি না থাকলেও···

মা তাঁর পুত্রবধূর কোনো নিন্দে শুনতে চান না, তবু তাঁর প্রতিবাদটা বেশ দুর্বল শোনালো। কঠোর সংসারের মধ্যগগনে যে মানুষের মন এরকম ভাবে বদলে যায়, সে সত্যটাও মা অস্বীকার করতে পারছেন না।

আমি বললুম, মেজমামা, তুমি বরং আমাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চলো। বিদেশে একটা চাকরি পেলে আমি কিছুদিন ট্রাই করতে পারি। আর কিছু না হোক বেড়ানো তো হবে!

মেজমামা বললেন, দূর, দূর, সিঙ্গাপুর আবার বিদেশ নাকি? নামের শেষে পুর আছে দেখছিস না? কেষ্টপুর, বিষ্টুপুরের মতনই আর একটা শহর সিঙ্গাপুর। আগে বোধহয় ওটার নাম সিংহপুর ছিল।

বৌদি বললো, সিঙ্গাপুরে নাকি গেলেই চাকরি পাওয়া যায়? নীলু যদি ওখানে একটা চাকরি পায়, তা হলে আমরাও বেড়াতে যেতে পারি সবাই মিলে।

মেজমামা বললেন, সেসব সুখের দিন আর নেই। এখন ইণ্ডিয়ানদের ধরে ধরে প্যাঁদাচ্ছে। ইণ্ডিয়ানদের এখন আর কোনো দেশই পছন্দ করে না। রক্ত-বীজের ঝাড় কিনা! ইণ্ডিয়ানদের আর কেউ চাকরি দেবে না, বরং অনেককে জোর করে প্লেনে তুলে দিয়ে ফেরৎ···

হঠাৎ কথা থামিয়ে বৌদির দিকে কটমট করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন মেজমামা। তারপর প্রচণ্ড ধমকের সুরে বললেন, আমি বিশ-বাইশ বচ্ছর ধরে ওখানে আছি, এর মধ্যে তোমরা ওখানে একবারও বেড়াতে যাওনি কেন? কে বারণ করেছিল? উষা তোমাদের বার বার যেতে বলে নি? নীলু চাকরি করে তোমাদের জন্য টিকিট পাঠাবে? এর মধ্যেই গলা দিয়ে আসল সুর বেরুচ্ছে?

মা বললেন, যাঃ, অলকা মোটেই সেরকম ভেবে বলেনি। হ্যাঁরে পিণ্টু,

ইণ্ডিয়ানদের যে ওখান থেকে তাড়াচ্ছে বলছিস, তা হলে তুই…তোর কিছু হবে না তো ? উষাদের ওখানে রেখে এলি, যদি বার্মার মতন কিছু হয় ?

মেজমামা সারা মুখে গর্বের হাসি ছড়িয়ে বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আমার কিছু হবে না। যদি ওদেশে মাত্র একজনও ইণ্ডিয়ান থাকে, তা হলে আমি থাকবো। আমাকে ছাড়া যে ওদের চলবে না। কেন জানো ? আমি ওদের টেলিফোন সিসটেমের এক নম্বর টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার। আমি চলে এলে সিঙ্গাপুরের টেলিফোনও কলকাতার মতন হয়ে যাবে !

আমি বললুম, মেজমামা, তুমি টেলিফোনের এতবড় একজন এক্সপার্ট, তাহলে তুমি কলকাতায় চলে আসছো না কেন ? তুমি এসে কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থাটা ঠিকঠাক করে দিতে পারো !

—আরে তুই তো মহা উজবুগ দেখছি, নীলু ! আমি কলকাতায় ফিরে এসে কী করবো ? কলকাতায় টেলিফোনে আমার চেয়ে বড় এক্সপার্ট নেই বলতে চাস ? নিশ্চয়ই আছে। এদেশে গুণী লোকের অভাব নেই। কিন্তু এরা ইচ্ছে করে টেলিফোনগুলো খারাপ করে রাখে। জনগণের স্বার্থে।

—তার মানে ?

—হ্যাঁ, জনগণের স্বার্থে। টেলিফোন খারাপ। তারপর লোডশেডিং। এদেশে যে-কটা পাওয়ার প্ল্যাণ্ট আছে, তাতে যথেষ্ট বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় না বলতে চাস ? আলবাৎ পারে। কিন্তু আদ্ধেকও তৈরি করে না। ইচ্ছে করে বানায় না। জনগণের স্বার্থে। এদেশের জনগণকে তা হলে আর ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে হয় না। মন মেজাজ ভালো থাকে। রাত্তিরে আলো জ্বলে না, টেলিফোন বাজে না, কল দিয়ে জল পড়ে না, রাস্তা সারাই হয় না, সেইজন্যই লোকে ভাবে, দুর শালা, তাহলে আমরাই বা কাজ করবো কেন ? চুকে গেল ঝামেলা ! কারুর আর কাজ করার দরকার নেই। অন্যান্য দেশে কাজ না করে মাইনে নিতে লোকে লজ্জা পায়, এদেশে সবাই গীতা নামে ঐ গ্যাঁড়াকলের বইখানা মাথায় নিয়ে বসে আছে।

মা বললেন, দুর্গা দুর্গা ! কী তোর কথার ছিরি পিণ্টু ! গীতা আবার কী দোষ করলো ?

—ঐ যে গীতায় কী একটা কথা আছে না, কাজ-ফাজ তোমার ইচ্ছেমতন যা খুশি করো, কিন্তু ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না ! সবাই সেটাকেই ধরে রেখেছে। একবার কী হলো জানো, ছোড়দি, আমার শ্বশুরমশাই যে-বারে মারা

গেলেন, তখন করপোরেশন থেকে একটা ডেথ-সার্টিফিকেট দরকার ছিল। ভস্তু যায় আর ফিবে আসে। করপোরেশনের সেই কেরানী বাবুটির সময়ই হয় না। এদিকে ব্যাঙ্কেব টাকা-ফাকা সব আটকে আছে। আমি তখন কলকাতায়। ভস্তুকে বললুম, চ তো আমি যাই তোর সঙ্গে! গিয়ে দেখি, একটা অন্ধকার, নোংরা ঘর, তার মধ্যে সেই কেরানীবাবুটি টেবিলে অনেক ফাইলপত্র ছড়িয়ে বসে আছেন। খুব ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব। আমি জিজ্ঞেস করলুম, ও মশাই, সেই ডেথ-সার্টিফিকেটটা? তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, দেখছেন তো কাজ করছি, কাজ না করে কি চুপ করে বসে আছি? আপনাদেরটা এখনো হয়নি কেন তা কী করে জানবো? বোঝো ঠ্যালা! উনি কাজ করছেন, কিন্তু ফল কী হচ্ছে, সেজন্য দায়ী নন। সে সব জানে কেষ্টঠাকুর! সাধে কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কেষ্টা ব্যাটাই চোর!

মা বললেন, হাতে এঁটো শুকিয়ে যাচ্ছে, তুই এবার ওঠ তো!

মেজমামা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, নীলু, তুই প্রেমট্রেম করিস? কোনো মেয়েকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে ঘোরাচ্ছিস না তো?

বিদেশে বেশিদিন থাকলে কি মানুষের কাণ্ডজ্ঞান একেবারে নষ্ট হয়ে যায়? মায়ের সামনে এরকম প্রশ্ন করার কোনো মানে হয়? আমি মেজমামার দিকে একটা ভৎর্সনার দৃষ্টি দিলুম, বৌদি হাসতে লাগলো, মা জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন, বৃষ্টি আবার বাড়লো দেখছি!

মেজমামা তবু বললেন, নিশ্চয়ই কোনো মেয়ে ওকে পাত্তা দেয় না, তাই নীলুর চেহারাটা হ্যাড়া-হ্যাড়া দেখাচ্ছে। আজকালকাব মেয়েরা সেয়ানা হয়ে গেছে। বেকারদের ধারও ঘেঁষে না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও কোনো মেয়ে জুটবে না। ছোড়দি, শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার ছোট ছেলের বিয়েই দিতে পারবে না। আর বেশিদিন বেকার থাকলে ওর গায়ে বিকট গন্ধ হয়ে যাবে।

মা বললেন, আহা, একটা কিছু পেয়ে যাবে ঠিকই। পাপুন বলছিল, নীলু যদি দিল্লি যেতে রাজি থাকে…

—ওসব দিল্লি-ফিল্লি ছাড়ো। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আমি সাত দিন থেকে যাচ্ছি এখানেই। এর মধ্যে নীলুর একটা কিছু হিল্লে করতেই হবে। কাল থেকেই বেরুবো।

—মেজমামা, তুমি রাস্তায় বেরুলেই টপাস করে একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলবে? আজকাল হাতের মোয়াও এত সহজে পাওয়া যায় না!

—চাকরি কী করে জোটাতে হয় তা আমি জানি না ভেবেছিস? ধরাধরি!

সব দেশেই এখন ধরাধরির জয়। যোগ্যতা-টোগ্যতা পরের ব্যাপার, আসল কথা হচ্ছে, তুমি ঠিক ঠিক লোককে চেনো কিনা! হাতে হাতে ধরতে নেই, পায়ে ধরলেও কোনো লাভ হয় না, একটা কিছু টোপ ফেলে ধরতে হয়। সিঙ্গাপুরের টোপ অতি উত্তম।

এর পরেই মেজমামা বিকট স্বরে একটা গান গেয়ে উঠলেন, 'ধরি ধরায়ে নমো, কৃষ্ণ যাদবায়ে নমো, একে ধরি, তাকে ধরি, ধরাধরি নমো…'

মা বললেন, এই পিণ্টু, চুপ কর। খেতে বসে গান গাইতে নেই, তাতে বউ পাগল হয়!

মেজমামা একগাল হেসে বললেন, আমার বউ তো অলরেডি পাগল! উষা আর বেশি কি পাগল হবে! আমার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় উষা ধেই ধেই করে নাচে!

তারপর বৌদির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, গানটা এইমাত্র বানালুম, কেমন হয়েছে, অলকা?

বৌদি বললো, চমৎকার গলা তো আপনার! আপনি টেলিফোনের…ইয়ে… না হয়ে গায়ক হতে পারতেন।

মেজমামা বললেন, ইয়ে মানে তুমি টেলিফোনের মিস্তিরি বলতে যাচ্ছিলে তো! ঠিকই বলেছো। কার নিয়তি যে কাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায়! হাজারিবাগে আমার জন্ম, এখন সিঙ্গাপুরে টেলিফোন সারাই!

মা বললেন, এবার মিষ্টি খা, পিণ্টু। তুই মিষ্টি ভালোবাসিস সেই ছোটবেলা থেকে।

মেজমামা একটা সন্দেশ টপাস করে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললেন, রথীন!

মা জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কে?

উত্তর না দিয়ে মেজমামা পরপর আরও দুটো সন্দেশ খেতে খেতে বললেন, সুরঞ্জন! নির্মল!

আমি, মা ও বৌদি একবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। মেজমামা এক প্রসঙ্গ থেকে কখন যে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, তা বোঝা খুবই শক্ত।

এক গেলাস জল এক চুমুকে শেষ করে একটা উপভোগের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেজমামা আবার বলে উঠলেন, এক্সেলেণ্ট, অনবদ্য, প্রাণ জুড়িয়ে গেল! সত্যি ছোড়দি, যতই লোডশেডিং থাক, টেলিফোন কিংবা রাস্তা খারাপ হোক, দেশের

মিষ্টি আর টাটকা মাছের মতন সুখাদ্য সারা পৃথিবীতে আর পাওয়া যাবে না। কে জানে, ঐসব জিনিসগুলো খারাপ আছে বলেই বোধহয় সন্দেশ-রসগোল্লা আর রুই-কাৎলাগুলোর স্বাদ এখনো ভালো আছে। তা হলে নীলু, কাল সকাল দশটা থেকেই আমরা চাকরির অভিযানে বেরুচ্ছি! দশটা, না এগারোটা? বড বড় বাবুরা কখন অফিসে আসেন?

বৃষ্টি এখনো থামেনি, বরং বেগ আরও বাড়লো। একবার কলকাতায় টানা সাত দিন বৃষ্টি হয়েছিল, এবারও সেরকম কিছু হবে বোধহয়। আসুক, আসুক, আরও বৃষ্টি আসুক, সারা কলকাতা ডুবিয়ে দিক কয়েক দিনের জন্য।

আঁচিয়ে আসার পর আরও কিছুক্ষণ গল্প চললো। এবার সিঙ্গাপুর বিষয়েই বেশি।

আমাদের ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর, দাদা-বৌদির, মায়ের আর আমার। বাড়িতে কোনো অতিথি এলে আমাকেই বাস্তুচ্যুত হতে হয়, রিফিউজি হতে হয় মায়ের ঘরে। তার মানেই সিগারেট বন্ধ। ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ ছাদে ঘোরাঘুরি করা আমার অভ্যেস, ছাদ আমাকে টানে। আজ বৃষ্টির জন্য যাওয়া যাবে না।

মেজমামা শুয়ে পড়ার পর আমি একবার বৌদির ঘরে এসে বসলুম। এই সময়টায় বৌদি আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ায়।

আমি চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলুম, বৌদি, তুমি বাজার করার জন্য যে ম্যাজিকের মতন একটা একশো টাকার নোট বার করে দিলে, তোমার কাছে ঐরকম নোট আর একখানা আছে নাকি?

বৌদি ভুরু তুলে বললো, কেন বলো তো? এত রাত্তিরে হঠাৎ টাকার কথা?

—থাকলে তোমার কাছ থেকে ধার নিতে চাই। কাল ভোরবেলা কেটে পড়বো।

— ভোরবেলা কেটে পড়বে, তার মানে?

—তোমরা কি আমাকে মেজমামার খপ্পরে ফেলে দিতে চাও? কাল থেকে আমার ঘাড় ধরে বিভিন্ন অফিসে অফিসে ঘুরবে চাকরির জন্য। দৃশ্যটা ভেবে ছাখো তো! ঐ দশাসই চেহারার মেজমামা। তার পেছনে পেছনে কাঁচুমাচু চেহারার আমি, অফিসের বেয়ারারাও আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাবে। চাকরি তো হবেই না, শুধু শুধু অপমান।

—মেজমামার মাথায় যখন একবার এই ব্যাপারটা চেপেছে, সহজে ছাড়বেন না। কী আর করবে, একটু ঘুরে এসো ওঁর সঙ্গে!

—তুমিও বুঝি মায়ের দলে চলে গেছ ? জোর-জবরদস্তি করে আমাকে চাকরিতে ঢোকাতে চাও ?

—না, না, আমি মোটেই চাই না, তুমি চাকরির কটা টাকার জন্য তোমার স্বাধীনতা বিসর্জন দাও ! মেজমামা তোমার চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবেন না। উনি তো জানেন না এখানকার অবস্থা। যদি বা কোনোক্রমে একটা জুটেও যায়, উনি চলে যাবার পরেই সেটা ছেড়ে দিও।

—তুমি আমায় একশো টাকা ধার দেবে না ? এর মধ্যেই তুমি এত কঞ্জুষ হয়ে গেলে ?

—শোনো নীলু, মিথ্যে কথা বলবো না, আর একখানা একশো টাকার নোট আমার কাছে আছে ঠিকই। কিন্তু তুমি কেটে পড়লে, আমি আর মা কি করে মেজ-মামাকে সামলাবো ? তাছাড়া, উনি যদি সত্যি সত্যি সাত দিন থেকে যান, তাহলে আরও খরচ আছে না ? এ টাকাতেও কুলোবে না। নীচতলা থেকে ধার করতে হবে।

—মেজমামা সাত দিন থাকলে উনি নিজেই বাজার করবেন।

—যাঃ, তা কখনো হয় নাকি ? এখন তোমার যাওয়া চলবে না, নীলু। তোমাকেই রোজ বাজার করতে হবে।

—আমাকে রোজ বাজার করতে হবে, র‍্যাশান আনতে হবে, কেরোসিনের জন্য লাইন দিতে হবে, গ্যাসের জন্য তদ্বির করতে হবে, নর্দমার ঝাঁঝরি হারিয়ে গেলে সেটা খুঁজতে হবে···। আমি চাকরি করি না বলে তোমরা আমাকে ভূতের মতন খাটাও !

—তুমি আমার ওপর রাগ করছো, নীলু ? এসব কে করবে বলো ? তোমার দাদা একদম সময় পায় না। আমি গিয়ে কেরোসিনের জন্য লাইন দিলে সেটা ভালো দেখাবে ? মা যেতেই দেবেন না আমাকে। আচ্ছা, তোমার দাদা ফিরুক, এবার বলবো একটা বাচ্চা দেখে কাজের ছেলে রাখতে। সত্যিই তো, তুমি এত সব করবে কেন ?

—তোমার ছাতাটা কোথায় রাখলে ? আর একবার দাও।

—ছাতা ? এত রাত্তিরে আবার কোথায় বেরুবে এই বৃষ্টির মধ্যে ?

—ছাদে যাবো।

বৌদির ঘরে বসে সিগারেট টানা যায় না। আজকাল নিত্য-নতুন থিয়োরি বেরুচ্ছে। এখন খুব শোনা যাচ্ছে প্যাসিভ স্মোকিং-এর কথা। যে সিগারেট খায় না, তার সামনে বসে অন্য একজন সিগারেট টানলেও সেটা তার পক্ষে সমান

ক্ষতিকর। বৌদি এই কথাটা প্রায়ই বলে। দাদাকে জোর করে সিগারেট ছাড়িয়েছে, আমাকে এখনো সুবিধে করতে পারেনি।

বৃষ্টি পড়ছে এখন মাঝারি ধারায়। ছাদে এসে মাথার ওপর ছাতাটা ঘোরাতে ঘোরাতে আমি পায়চারি করতে লাগলুম। শহরটা এখন অদ্ভুত শান্ত আর নিস্তব্ধ। কাছে-দূরে কোনো বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। বাদলার দিনে কেউ রাত জাগতে চায় না, অথচ রাতটা কী সুন্দর!

মাথাটায় সামান্য সামান্য ব্যথা করছে। কিছুদিন ধরে হচ্ছে এরকম, হঠাৎ হঠাৎ ব্যথাটা আসে। ঠিক মাথাধরা নয়, চিড়িক চিড়িক করতে থাকে মাথার এক দিকটায়। কী এর মানে? কারুকে জানাইনি, কোনো ওষুধ খাইনি। বেশিক্ষণ থাকে না অবশ্য। কারুকে বলতে গেলেই হয়তো শুনবো, ধুস, এটা আবার একটা ব্যাপার নাকি? এরকম তো সকলেরই হয়। মাথা থাকলেই মাথার মধ্যে কখনো না কখনো চিড়িক চিড়িক করবেই।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে দেখি, ছাদের দক্ষিণ কোণে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি পরা, মাথার চুল খোলা। বৌদি কখন উঠে এলো ছাদে? আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে?

থমকে দাঁড়িয়ে ভালো করে তাকালুম। না, বৌদি নয়। আমার বৌদির ছোটখাটো চেহারা। বৌদি আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, কিন্তু, অনেকেই ভাবে ওর বয়েস বাইশ-তেইশের বেশি না। এই মেয়েটি বেশ লম্বা, খুব ছিপছিপেও নয়, আলো-আঁধারিতে আর কিছু ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

একবার আমার বুকটা কেঁপে উঠলো।

পরের মুহূর্তেই ভাবলুম, নীচতলায় ভাড়াটেদের কেউ ছাদে উঠে এসেছে? সচরাচর আসে না। ভাড়াটেদের মধ্যে এই রকম তরুণী মেয়ে ছিল একমাত্র দীপা, কিন্তু এই মার্চ মাসে তার বিয়ে হয়ে গেল। আর যে দুটি মেয়ে আছে, তারা ফ্রক পরে। অবশ্য ভাড়াটেদের কাছে বাইরে থেকে কেউ বেড়াতে আসতে পারে। আমাদের বাড়িতে যেমন মেজমামা এসেছে।

মেয়েটি আমারই দিকে চেয়ে আছে। বৃষ্টিতে যে ভিজছে, তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমার ছাতাটা ঐ মেয়েটিকে দেওয়া উচিত। ছাতা দিতে গেলে কথা বলতে হয়। অন্ধকার ছাদে একটি অপরিচিতা নারীর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যাওয়াটা কি শোভন হবে?

মেয়েটি মুখ ফেরাচ্ছে না, শুধু আমাকেই দেখছে কেন ?

আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

সিঁড়ির দরজায় ছিটকিনি বন্ধ ছিল না ? আমিই তো খুললুম। না, না, তা হতে পারে না, তা হলে এই মেয়েটি ছাদে এলো কী করে ?

নীচ তলার ভাড়াটেদের কাছে যদি কোনো নতুন মেয়ে এনে থাকে, তা হলে সে একা একা এই সময় ছাদে আসবে ?

বুঝতে পারছি, আমার ছাতা-ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে। আমি কি ভয় পেয়েছি ? ধারাবর্ষণের রাতে, ফাঁকা ছাদে একটি মেয়েকে দেখে ভয় পাবার কী আছে ?

দীপা যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে সে কথা বলবে না কেন ? আমার সঙ্গে তো দীপার কোনো অভিমানের সম্পর্ক ছিল না, বরং ছিল ঠাট্টা-ইয়াকির। আমি বেকার বলে দীপা সব সময় আমাকে ক্ষেপাতো।

দীপা হতে পারে না, দীপাও এত লম্বা নয়। তার ছোটখাটো চেহারা, তাকে ধানী লঙ্কা বলে খুব রাগানো যেত।

অন্ধকারে এই মেয়েটির সিলুয়েট শরীরের গড়ন বেশ নিখুঁত বলে মনে হয়। সঙ্কোচে আমি পুরোপুরি তাকাতে পারছি না, আবার বেশিক্ষণ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখতে পারছি না চোখ।

আমার বুকের ভেতরে শব্দ হচ্ছে, আমার শরীর কাঁপছে !

যদি ভাড়াটেদের কোনো অতিথি হয়, তা হলে ছাদটা তাকেই এখন ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার এখানে থাকাটা অশোভন। কিন্তু মানুষের কৌতূহল যে রাগ, লোভ কিংবা হিংসের চেয়েও প্রবল।

ফেরার জন্য পা বাড়িয়েও আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না।

ঠিক এই সময় অনেকখানি আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকালো। এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাকে। তার সুশ্রী মুখখানি কৌতুকের হাসিতে ঝলমল করছে।



আমার ধারণা ছিল, বিদেশে যারা থাকে, তাদেব খুব খাটতে হয় বলে ছুটির দিনে অনেক বেলা করে ঘুমোয়। কিন্তু মেজমামা আমার অনেক আগেই, একেবারে ভোরবেলা জেগে বসে আছেন।

বৌদির সকালের স্কুল, তার এই সময় বেরুবার তাড়া থাকে। বৌদি নিজেই প্রথম চা-টা বানিয়ে দিয়ে যায়। তারপর জলখাবার ও বাকি রান্নার ভার মায়ের ওপর। একমাত্র আমারই আটটার আগে কোনো কাজ নেই। তবু আমাকেও আজ বিছানা ছাড়তে হলো।

অন্যদিন ঠিকে ঝি-র বাসনপত্র মাজার ঘ্যাস ঘ্যাস ঠনাৎ ঠন আওয়াজ শুনতে পাই, আজ তা ঢেকে গেছে মেজমামাব গলা সাধায়। নিজের ঘবে বসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইছেন। খুব যে একটা বেসুরো তা বলা যায় না। বাজখাঁই ধবনের। কোকিলের স্বব মিষ্টি, তা বলে শালিক-চিলরা কি ডাকবেই না?

গান থামিয়ে মেজমামা হাঁক দিলেম, অলকা, আর এক কাপ চা খাওয়াবে?

মা আমাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বললেন, এই নীলু, বিস্কুট একেবারে ফুরিয়ে গেছে। চট করে নিয়ে আসবি? সকালবেলায় কি শুধু চা দেওয়া যায়? দুধটাও নিয়ে আয় এই সঙ্গে।

এই শুরু হয়ে গেল আমার চাকরি! কে বলে আমি বেকার?

বৃষ্টি একটু থামলেও আকাশে জমজমাট মেঘ। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার এক হাঁটু জল জমে আছে। তা হলে ভবানীপুরে নিশ্চয়ই কোমর পর্যন্ত। আজও খিচুড়ির দিন।

আমারই সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বৌদি বললো, আমি চট করে একবার ইস্কুলটা ঘুরে আসি। ক্লাস বোধহয় হবে না। তবু, কাল যাইনি তো। একবার হাজিরাটা দেওয়া দরকার। তুমি বিস্কুট আনতে যাচ্ছো তো, গোটা কয়েক ডিম আর হাফ পাউণ্ড পাঁউরুটিও নিয়ে এসো একেবারে। বারবার যাবে কেন?

আমি বললুম, কাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, আমাদের এই রাস্তার

একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়লো।

বৌদি খানিকটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

আমি নিস্পৃহ ভাবে আবার জানালাম যে, এমনিতেই করপোরেশনের গাড়ি সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। কাল সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে তো ওদের গাড়ি বেরোয়ইনি। সেই কুকুরটা পচে-গলে এই বৃষ্টির জলে মিশে আছে।

বৌদি চরম ঘেন্নায় নাক কুঁচকে বললো, এঃ মাগো! পচা কুকুর?

আমি বললুম, আমার কোনো অসুবিধে হবে না। খালি পায়ে এই জল ঠেলে চলে যাবো, ফিরে এসে পা ধুয়ে নেবো!

বৌদি ছটফট করতে করতে বললো, আমি কিছুতেই এই জলে পা দিতে পারবো না। ওরে বাবারে, না, না, এই নীলু, তুমি প্লিজ আমাকে একটা রিক্সা ডেকে দাও!

—বৃষ্টির দিনে রিক্সা? তোমার মাথা খারাপ? ট্যাক্সির তিনগুণ ভাড়া চাইবে।

—আমি রিক্সা ছাড়া যেতে পারবো না। লক্ষীটি, নীলু, একটা রিক্সা ডেকে দাও!

—আর ক'খানা একশো টাকার নোট লুকিয়ে রেখেছো?

বৌদিকে সদর দরজায় দাঁড় করিয়ে আমি নেমে পড়লুম জলে। বৌদি কুকুরের কু-টুকু শুনলেই ভয় পায়। একবার আমাদের পাশের বাড়ির একটা বাচ্চা মেয়েকে কুকুরে কামড়েছিল, তা শুনে বৌদির পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল! বৌদির ধারণা, সারা পৃথিবীটাই পাগলা কুকুরে ভর্তি।

রিক্সা পাবার আশা এখন খুবই কম। এই সব রাস্তায় জল-জমা বৃষ্টির দিনগুলোতে রিক্সাওয়ালারাই রাজা। অন্য সময় তাদের যত হেলা-তুচ্ছ করা হয়, তার সব শোধ ওরা নেয় এই কটা দিনে।

জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে এখানে ওখানে পড়ে আছে কয়েকটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। তার পাশ দিয়ে সওয়ারি নিয়ে অবলীলাক্রমে দৌড়ে চলে যাচ্ছে রিক্সাওয়ালারা।

স্টেশনারি দোকানটায় আজকের কাগজ এসে গেছে। তাতে বেশ ভালো ভালো খবর পাওয়া গেল। বেলেঘাটায় আর ভবানীপুরে দুটো পুরোনো বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তালতলায় খোলা হাইড্রান্টের মধ্যে হারিয়ে গেছে একটা বাচ্চা ছেলে। ট্রামের তার ছিঁড়ে গেছে, বাস উল্টে গেছে, অনেকগুলো লোক্যাল ট্রেন চলেনি, গাছ ভেঙে পড়ে কয়েকটা রাস্তা বন্ধ, তিন দিনের বৃষ্টিতে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত।

আজও অফিস-টফিসে বিশেষ কেউ আসবে বলে মনে হয় না।

গুরু গুরু করে একবার আধা-ঘুমন্ত সিংহের মতন মেঘ ডাকলো!

আমি মনে মনে বললুম, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে! আরও বৃষ্টির দরকার। আজকের মতন মেজমামার সঙ্গে চাকরি খোঁজার অভিযানটা বন্ধ করতেই হবে!

সত্যিই আবার বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো একটু পরেই। মেঘের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, মেঘ আমার কথা শোনে।

বৃষ্টির প্রতি আমার ভালোবাসা সুগভীর ও অকৃত্রিম। এপ্রিল-মে মাসে যারা গরমে হাঁসফাঁস করে, বৃষ্টির জন্য হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে, তারাই অনেকে জুলাই-আগস্ট মাসে বিরক্তির সঙ্গে বলে, ওঃ সর্বক্ষণ বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আর পারা যায় না! এরা অকৃতজ্ঞের দল। যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময় বৃষ্টি আমার প্রিয়। এমনকি মাঝ রাস্তায় হঠাৎ বৃষ্টি এসে আমায় চুপচুপে করে ভিজিয়ে দিলেও আপত্তি নেই। কোনো ফাঁকা মাঠের মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত বৃষ্টির দৃশ্যে আমি যেন একটা অলৌকিকের আভাস পাই।

বৃষ্টি কম না হলে যে চাষ-বাস নষ্ট, চাষীদের মাথায় হাত, সে কথা অনেকে বোঝে না। কেউ কেউ আবার বলে, কলকাতা শহরে এত বৃষ্টি হবার দরকারটা কি? এত জল শুধু শুধু নষ্ট। এই সব বৃষ্টি ধানক্ষেতগুলোতে হলেই তো পারে।

কী আব্দার! বৃষ্টির দেবতা একখানা বিরাট কাঁচি দিয়ে কলকাতার আকাশ থেকে মেঘগুলো কেটে কেটে ধানক্ষেতে ছুঁড়ে দেবেন!

ডিম পাঁউরুটি বিস্কুট আর দুধের বোতল নিয়ে ফেরার সময় দেখি যে আমাদের বাড়ির সামনে একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতায় জিপ দেখলেই আমার পুলিসের কথা মনে পড়ে। আমাদের বাড়িতে পুলিস?

দোতলার ভাড়াটেদের একটা ছেলে খুব গরম গরম ছাত্র রাজনীতি করে। আমাকে প্রায়ই নানা কথা বোঝাতে আসে। নকশাল আন্দোলনটাকে সে আবার চাঙ্গা ক'রে তুলতে চায়। আমার চেয়ে বয়েসে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও সে বলে, আপনাদের মতন বেকারদেরই তো উচিত সব কিছু ভাঙচুর শুরু করা! এর মধ্যে একবার সে তিন দিনের জন্য জেল খেটেছে বলে তাই নিয়ে গর্ব করে খুব।

তার জন্য পুলিস এসেছে? কিন্তু এমন দুর্যোগের দিনে নিছক এক ছাত্রনেতাকে ধরতে আসবে, পুলিসের কী মাথা খারাপ হয়ে গেল!

ওপরে এসে দেখি মেজমামার শালা ভন্তু বসে আছে।

ভন্তুর বয়েস বছর তিরিশেক। আমার থেকে কিছুটা বড় বলে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় একটা ভারিক্কিভাব দেখায়। তাছাড়া ভন্তু সাকসেসফুল। আগে সে রাইটার্স বিল্ডিংসে ইউ ডি ক্লার্ক ছিল, বছর দু'এক হলো সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পার্টনারশীপে ফ্ল্যাট বানবার ব্যবসা শুরু করেছে। একে বলে ডাব্‌ল প্রমোশন। এই বাজারে চাকরি পেয়েও ছেড়ে দেওয়া, তার ওপরে ব্যবসা। আমাকেও সে একবার প্রস্তাব দিয়েছিল, তুই পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক লোন ম্যানেজ কর নীলু, তোকেও আমাদের কম্পানির পার্টনার করে নেবো।

এই ম্যানেজ কথাটা ভন্তুর মুদ্রাদোষ।

জিপ গাড়িটা ভন্তুই এনেছে। তার কম্পানির নতুন গাড়ি। এই জিপ নিয়ে সে কাল এয়ারপোর্টে মেজমামাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল। পৌঁছেতে দেরি করেছিল চল্লিশ মিনিট, এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যেও যে প্লেন ঠিক সময়ে আসবে, তা সে বুঝবে কী করে ?

মেজমামাব কাছ থেকে কাল কোনো টেলিফোনও না পেয়ে সে আজ সকালেই খোঁজ নিতে এসেছে।

ভন্তুকে দেখেই আমি বেশ উৎফুল্ল বোধ করলুম। তা হলে আজই মেজমামার মুর্শিদাবাদে শ্বশুববাড়ি চলে যাওয়ার কোনো বাধা নেই।

তিন কাপ চা নিয়ে বসার পর আমি বললুম, আজকের কাগজে লিখেছে, মুর্শিদাবাদের দিকে এবার বৃষ্টি কম হচ্ছে। কাল-পরশু বৃষ্টিই হয়নি, সব রাস্তা খোলা।

ভন্তু বললো, আমাদের ওদিকে সব সময় রাস্তা খোলা থাকে।

মেজমামা বললেন, দূর ছাই ! ওদিকে বৃষ্টি হয়নি ? তা হলে তো পুকুরে মাছও নেই ?

আমি বললুম, মাছ থাকবে না কেন ? বেশি বৃষ্টি হলেই বরং পুকুর উপছে মাছ বেরিয়ে যায়। কম বৃষ্টিতে মাছ ভালো থাকে।

মেজমামা একগাল হেসে বললেন, তুই মাছের এক্সপার্ট কবে থেকে হলি রে, নীলু ?

আমি বললুম, ওয়েদার ফোরকাস্টে আছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা কলকাতা আর চব্বিশ পরগণায় হেভি বৃষ্টি হবে। এরপর তুমি আটকে যাবে মেজমামা, মুর্শিদাবাদ যেতেই পারবে না।

মেজমামা বললেন, আমি তো এবার বৃষ্টি দেখতেই এসেছি রে ! ওদিকে তা

হলে আর এখন যাবো না! কান্দীতে গেলেই তো ভম্ভর মা ঘ্যানোর ঘ্যানোর করবে, কেন উষাকে আনিনি, ছেলেমেয়েদের আনিনি! ভম্ভর দিদিটা যে জেদী, একরোখা আর আধপাগলা তা কি সেই ভদ্রমহিলা বুঝবেন! বউ সঙ্গে না থাকলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সুখ নেই।

ভম্ভ বললো, জামাইবাবু, ও কথা বলবেন না। আপনার জন্য সব রেডি করা আছে। পুকুরের বড় বড় মাছগুলো ম্যানেজ করে রেখে দিয়েছি, জাল ফেললেই টপাটপ উঠবে। আপনি নিজে ছিপ ফেলেও ধরতে পারেন। দু'ছড়া মর্তমান কলা হয়েছে, গাছেই রেখেছি, কাটিনি এখনো। ভাগলপুরী গাই ম্যানেজ করেছি একটা, দুধ যা খাওয়াবো না, ফার্স্ট ক্লাস। আমি তো চাইছি, আজই এই জিপ নিয়ে সোজা স্টার্ট করতে। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবো।

মেজমামা বললেন, তোর এই জিপটা জলে আটকায় না বুঝি?

ভম্ভ বললো, জলে আটকাবে কি? ব্রাণ্ড নিউ সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছি। ছোট-খাটো নদী ম্যানেজ হয়ে যাবে অনায়াসে।

মেজমামা বললেন, গুড! তোর জিপটা নিয়েই আজ বেরুবো। কলকাতায় কয়েকটা জায়গা ঘুরবো। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ভম্ভ বললো, নো প্রবলেম। যেখানে যেতে চান, নিয়ে যাবো।

তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, নীলু, চাকরি টাকরি ম্যানেজ করেছিস এর মধ্যে?

যতবার দেখা হবে, ততবারই ভম্ভ জিজ্ঞেস করবে এই কথাটা।

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই মেজমামা অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, এবার ছাখ না কী করি। এতদিন বাবু গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিল, এবার হালে জুড়ে দেবো। নীলু আমাকে আজই মুর্শিদাবাদ পাঠাবার চেষ্টা করেন, তা আমি বুঝি না? আমরা সবাই চাকরিতে খেটে খেটে মরছি, আর তুই শালা সারা জীবন ছুটিতে কাটাবি?

আমি আঙুল তুলে বললুম, মেজমামা, আমি তোমার শালা নই। তোমার শালা ঐ যে!

মেজমামা বললেন, ভম্ভকে এখন আর শালা বলা যাবে না, সম্বন্ধী বলতে হবে। শিগগিরই ও আমার চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করবে। এক সঙ্গে ক'টা ফ্ল্যাট বাড়ি বানাচ্ছিস রে?

ভম্ভ বললো, তিনখানা প্রজেক্টে হাত দিয়েছি। আরও একটা ম্যানেজ হয়ে যাবে।

মা রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, নীলু, এগুলো একটু নিয়ে গিয়ে ওদের দে!

আধডজন ডিম এনেছিলুম, মা দুটো ডবল ডিমের ওমলেট বানিয়েছে ভন্তু আর মেজমামার জন্য। আমার জন্য সিঙ্গল! ওদের ওমলেটের পাশে আমারটা কত সরু, গোবেচারা, করুণ চেহারা। শুধু শুধু একটা ডিম বাঁচাতে গেল কেন মা? দাদা বাড়িতে থাকলে কি তাকে কম দেওয়া হতো?

মায়ের এরকম পক্ষপাতিত্ব আমি আগে কখনো দেখিনি। বাড়িতে ডিম কম পড়লেও না হয় কথা ছিল! আমি আধখানা ডিম পেলেও খুশি থাকতে পারি, কিন্তু ভন্তু ডবল ওমলেট পাবে কেন? ও এখন অনেক টাকা করছে বলে? ভন্তুর রোজগারের এক পয়সাও মা কোনোদিন নেবেন না বা পাবেন না, তবু সে বড়-লোক বলেই তাকে খাতির করতে হবে। আশ্চর্য মানুষের মনস্তত্ব!

একটু বাদে ভন্তু ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে চলে গেল। সাড়ে দশটার সময় সে জিপটা পাঠিয়ে দেবে।

মেজমামার বাঁ পায়ের গোড়ালিটা বেশ ফুলেছে। কাল হলুদ-চুন বা কোনো ওষুধ লাগাননি। পা টেনে টেনে বারান্দা পর্যন্ত এসে বললেন, মানুষ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটলে আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব আসে, তাই না রে?

আমি বললুম, আপনার ব্যক্তিত্ব তো কিছু কম পড়েনি।

মেজমামা বললেন, গোড়ালিটায় একটু ব্যথা হয়েছে। ব্যথাটা আমি বেশ এনজয় করছি, এমনিতে তো আমার অসুখ-বিসুখ প্রায় হয়ই না।

মা বললেন, বৃষ্টি তো থামছেই না। তা হলে আজ আর না বেরোলি, পিন্টু! আজ দুপুরটা খেয়ে-দেয়ে ঘুমো। একটা দিন বিশ্রাম নে।

মেজমামা বললো, তুমি টেস্ট করছো, ছোড়দি? দেখছো, আমার মনে আছে কি না? নীলুকে নিয়ে আজ আমি ঠিকই বেরুবো। তোমার ভাগ্যের জোর থাকলে আজই ওর চাকরি হয়ে যাবে।

মা বললেন, আহা, আজই যেতে হবে তার কি মানে আছে? এখন তো থাকছিস কয়েকটা দিন।

মেজমামা উদ্ভাসিত মুখে বললেন, শুভস্য শীঘ্রম! অশুভস্য কাল হরণম! কী রকম সংস্কৃতটা মনে আছে দেখলে? কই রে, নীলু, তৈরি হয় নে। ভালো জামা-প্যান্ট আছে তো? আমার একটা টাই দিচ্ছি, টাই বাঁধতে জানিস?

বৌদি ফিরে এসেছে একটু আগে। আমার সঙ্গে বৌদির আজ কথা বন্ধ থাকার কথা। সকালে আমি রিক্সা ডেকে না দিয়ে ওর স্কুলের লেট করিয়ে দিয়েছি।

বৌদি তবু নিজের ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো, ও টাই পরবে কেন মেজ-মামা ? বাঙালী অফিসে আবার টাই পরে যায় নাকি কেউ ?

মেজমামা বললেন, বাঙালীরা টাই পরে না ? আমি দেখিনি ভেবেছো ? আমি ঢের ঢের বাঙালী সাহেব দেখেছি ! সিঙ্গাপুরে বেড়াতে আসে, সব গলায় টাই ঝুলিয়ে !

বৌদি বললো, সে তো অফিসারদের চাকরি ! নীলুর জন্য আপনি কি···

বৌদি আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে হেসে উঠলো। যেন আমার পক্ষে একটা অফিসারের চাকরি পাওয়ার কথা পাগলেও চিন্তা করতে পারে না !

এ ব্যাপারে অবশ্য আমি বউদির সঙ্গে একমত। চাকরির ব্যাপারে আমার কোনো বাছ-বিচার নেই। সব চাকরিই আমার অপছন্দ ! 'পৃথিবীতে নাই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরি !'

মেজমামা টাই পরা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু জুতো নিয়ে একটা ঝঞ্ঝাট বাধলো। আমি তো বরাবরই প্যান্টের সঙ্গে চটি পরে চালিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু চাকরির ইণ্টারভিউতে গেলে নাকি শু পরা বাধ্যতামূলক। চটি পায়ে দিয়ে গেলে কেউ কক্ষনো চাকরি পায় না।

যাক বাঁচা গেল। আমাব শু নেই। আমি ইয়ার্কির সুরে বললুম, ধুতি-পাঞ্জাবি চলবে ?

বৌদি বললো, যাঃ, বাঙালিরা আজকাল আব ধুতি পাঞ্জাবি পরে নাকি ? সে তো শুধু বিয়ে আর শ্রাদ্ধের দিনে।

তা হলে যাওয়া হচ্ছে না তো ? আগে শু কিনে কয়েকদিন পরা প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। নতুন জুতো পায়ে দিলেই ফোস্কা পড়ে। ইণ্টারভিউ দিতে গেলে খোঁড়ানো পায়ের ব্যক্তিত্ব কি সাহেবরা পছন্দ করবে ?

মা কোথা থেকে একজোড়া পুরনো জুতো টেনে বার করলেন। বছর দেড়েক আগে আমি একবার দার্জিলিং গিয়েছিলাম শীতকালে। অত ঠাণ্ডায় চটি পরে ঘোরা যায় না বলে আমার মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে এই জুতো ধার নেওয়া হয়েছিল। আর ফেরত দেওয়া হয়নি। এত দিনে সে ভুলেও গেছে।

জুতো জোড়ার ওপরে সবুজ ছাতকুঁড়ো জন্মে গেছে, ভেতরে মাকড়শার জাল। তবু সেই জুতোই পরিষ্কার করার জন্য মা আর বৌদির কি উৎসাহ !

বৌদি যে এতদিন ধরে আমার বেকার থাকাটা সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিল, সেটা আসলে আন্তরিক নয় ? বৌদিও চায় আমি চাকুরিজীবীদের ব্যাণ্ড ওয়্যাগনে যোগ

দিই ? কিংবা, মেজমামার সঙ্গে বেরিয়ে বিভিন্ন অফিসে আমি কতটা নাকানি-চোবানি খাই, সেটা দেখাই ওর উদ্দেশ্য।

বেরুবার আগে মাকে প্রণাম করতেই মা আমার পকেটে কী সব পুজোর ফুল-টুল গুঁজে দিলেন। বৌদি গান গেয়ে উঠলো, জয় যাত্রায় যাও গো।

মেজমামা গলা মেলালেন, ওঠো, ওঠো জয় রথে···ঐ যে জিপ এসে গেছে!

এরকম বোকা বোকা মুখ করে আমি কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোইনি। ঠিক যেন নব-কার্তিক! পালিশ করা চকচকে জুতো, নিপাট চুল আঁচড়ানো, মা ও বৌদির দৃষ্টি যেন গায়ে ফুটছে। আপত্তি করাব কোনো প্রশ্নই ওঠে না, মেজমামা তা হলে আমায় বেড়ালছানার মতন শূন্যে তুলে নিয়ে যাবেন।

এরকম অবস্থায় রাগ করেই বা লাভ কী, আমি ঠোঁটেব দু'পাশ দিয়ে ফুরফুরে হাসি ছড়াতে লাগলুম।

জিপে উঠে মেজমামা বললেন, প্রথমে যাবো ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। নীলু, তুই নির্মল পত্রনবীশেব নাম শুনেছিস? আই এ এস অফিসার, ভারি ভালো ছেলে। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে আমার রুমমেট ছিল। আমার অত্যাচার সহ্য করেও টিকে ছিল, তা হলেই বুঝতে পারছিস, কতখানি ওর সহ্য শক্তি! খুব পরোপকারী। নির্মলের কাছে গেলেই তোর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

খবরের কাগজে যে-রকম লিখেছে, সে রকম কোনো ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়লো না। মাঝে মাঝে দু-চারটে গাছ ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু কোনো কোনো রাস্তায় জল কমে গেছে অনেকটা। ট্রাম বন্ধ, কিন্তু বাস ও ট্যাক্সি যাতায়াত করছে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পৌঁছোতে বেশি বেগ পেতে হলো না। এ রাস্তায় অবশ্য জল জমে অনেক, লাইট হাউজ সিনেমার সিঁড়িতে ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ করছে।

এখানে ফুড ডিপার্টমেন্টের একটা অফিস আছে, সেখানে নির্মল পত্রনবীশ একবেলা বসেন, অন্য বেলায় তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস চলে যান। এই সব খবর মেজমামা ভন্তুর কাছ থেকে পেয়েছেন, সে এই দফতরেই কাজ করে গেছে এক সময়।

ভন্তু ঐ নির্মল পত্রনবীশের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। ওরকম ভদ্র আর কর্মবীর অফিসার বিশেষ দেখা যায় না নাকি!

গত দু'দিন বোধ হয় অনেকেই আসেনি, তাই আজ মরীয়া হয়ে বেশ কিছু কর্মচারী হাজিরা দিয়েছে। পত্রনবীশ সাহেবের ঘরের বাইরে একটা ছোট ঘর, সেখানে বেশ একটি চটপটে যুবক বসে আছে। মেজমামা মুখ খুলতেই সে জিজ্ঞেস

করলো, আপনাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে ? নেই ? তা হলে তো আজ দেখা হবে না। উনি কনফারেন্সে ব্যস্ত আছেন।

মেজমামা বললেন, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট কী করে করবো ? টেলিফোন খারাপ।

যুবকটি বললো, সব টেলিফোন তো খারাপ নয়। আমাদের তিনটের মধ্যে একটা চালু আছে।

মেজমামা বললেন, আপনাদের তিনটি, কিন্তু আমাদের যে সবেধন নীলমণি। নাকি, কালোমণি। সে যে বোবা!

যুবকটি বললো, ঠিক আছে। আপনার নাম বলুন, আমি অ্যাপয়েমেণ্টমেণ্ট দিয়ে দিচ্ছি। সামনের সপ্তাহে শুক্রবারের আগে হবে না। না, হচ্ছে না আগে।

মেজমামা বললেন, এ কি দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট, যা দশ দিনের পরেরটা ছাড়া কিছুতেই পাওয়া যাবে না ? আমাকে যে আজই দেখা করতে হবে।

যুবকটি বললো, আজ অসম্ভব। উনি অলরেডি কনফারেন্সে বসে গেছেন, এর পর আরও দুটো আছে।

মেজমামা বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে বললেন, এই ঘরে কনফারেন্স ? ক'জন মিলে কনফারেন্স হয় ? সবাই মনে মনে কথা বলেন নাকি ? কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না তো ?

যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বললো, যাবেন না, যাবেন না, ওদিকে যাবেন না, খুব জরুরি।

মেজমামা হেসে বললেন, দ্যাখো ভাই, আমার নাম পিনাকপানি বাঁড়ুজ্যে, থাকি সিঙ্গাপুরে। কোনো কাজে দশ দিন দেরি করার হ্যাবিট নেই, আর শুধু শুধু ফিরে যাওয়াও আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই!

তারপরই তিনি বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, নির্মল! নির্মল!

আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঢুকে গেলেন চেম্বারের মধ্যে।

ভেতরে এসে কিন্তু খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন মেজমামা। বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন একজন খুব রোগা, ছোট্টখাট্টো মানুষ, তিনি এক-মনে একটা ফাইল পড়ছেন। আর একজন মধ্যবয়েসী, টাক-মাথা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ফাইল থেকে একটার পর একটা কাগজ ফেলে দিচ্ছেন মাটিতে।

মেজমামা দু'জনের দিকে পর্যায়ক্রমে বারবার দেখলেন, কিন্তু নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকে চিনতে পারলেন না। অথচ বাইরে নির্মল পত্রনবীশ নাম লেখা আছে ঠিকই।

দু'জন ভদ্রলোকই মেজমামার চ্যাঁচামেচিতে বিচলিত না হয়ে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন। একজন আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের যুবকটি আমাদের পেছন পেছন ঢুকে বলতে লাগলো, ট্রেস পাস, ট্রেস পাস!

মেজমামা বিমূঢ়ভাবে বললেন, নির্মল নেই এখানে? মিস্টার এন পত্রনবীশ, আই এ এস?

ছোটখাট্টো মানুষটি এবার মুখ তুলে কয়েক পলক দেখলেন মেজমামাকে। তারপর নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, পিন্টু? কবে দেশে ফিরলি?

মেজমামা চোখ গোল গোল করে বললেন, তুই···তুই···নির্মল? এমন পাল্টে গেলি কী করে? আমি চিনতেই পারিনি! বছর চারেক আগেও তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

নির্মলবাবু বললেন, বোস পিন্টু, বোস।

পেছনের যুবকটিকে তিনি ইঙ্গিত করে বললেন, ঠিক আছে। আপনি একটু চা দিতে বলুন।

দু'খানা চেয়ার টেনে আমার দিকে ফিরে মেজমামা বললেন, নীলু, বসে পড়। এই হচ্ছে আমার বন্ধু নির্মল পত্রনবীশ, ওর ডাকনামটা এত খারাপ যে অফিস-টফিসে বলা যায় না। একটানা তিন বছর আমরা হোস্টেলের এক ঘরে কাটিয়েছি। দু'জনে একসঙ্গে সিগারেট টানতে শিখেছিলুম। তোর মনে আছে নির্মল?

নির্মলবাবু সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন।

মেজমামা বললেন, আমি ছেড়ে দিয়েছি। তোর বাড়ির খবর বল, বউ-বাচ্চারা সব ভালো আছে তো?

কিছুক্ষণ দুই বন্ধুতে পারিবারিক কথা, কলেজ জীবনের অন্যান্য বন্ধুদের খোঁজ-খবর চললো। এই সব গল্পে অন্য লোকদের কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। যাদের চিনি না, শুনি না, তাদের সম্পর্কে হাসির কথাতেও হাসা যায় না। এই ধরনের বিরক্তিকর সময়ে আমার টেবিলে তবলা বাজানো অভ্যেস।

একটুখানি বাজিয়েই হাত সরিয়ে নিলুম। চাকরির উমেদারি করতে এসে বোধ হয় এটা চলে না।

অন্য ভদ্রলোকটি আপন মনে একটার পর একটা কাগজ ফাইল থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। এটা তো বেশ মজার কাজ!

খানিক বাদে মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এত রোগা হয়ে গেলি কী করে, নির্মল? একেবারে চেনাই যায় না।

নির্মলবাবু ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, হ্যাঁ, খুব রোগা হয়ে যাচ্ছি। সবাই বলে।

—হেভি ডায়েটিং করছিস? কিন্তু এ যে রীতিমতন অসুস্থতার লক্ষণ মনে হচ্ছে।

—তাই হবে বোধ হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে। আমি দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছি!

—ছোট হয়ে যাচ্ছিস? তাব মানে?

—দিন দিন আমার হাইট কমে যাচ্ছে। তোব মনে আছে, আগে আমি পাঁচ নয় ছিলাম?

—হ্যাঁ, মনে আছে। আমি পাঁচ এগারো, তুই পাঁচ নয়!

—এখন কত হয়েছি দ্যাখ।

নির্মলবাবু উঠে গিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। সেই দেয়ালে ফুট-ইঞ্চির দাগ কাটা আছে, অর্থাৎ লম্বা একটা স্কেলের ছবি আঁকা। রঙিন।

পা থেকে জুতো খুলে, দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে নির্মলবাবু বললেন, দ্যাখ, পাঁচ সাত হয়ে গেছি। প্রত্যেক মাসে একটু একটু কমে ছোট হয়ে যাচ্ছি। রোজ মেপে দেখি।

মেজমামা বললেন, এ যে অদ্ভুত ব্যাপার। কখনো শুনিনি। ডাক্তার দেখাসনি?

—ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারে না।

—তুই এক কাজ কর, নির্মল। ছুটি নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে আয়। ওখানে বিরাট বিরাট ডাক্তার আছে, তাদের মধ্যে দু'জন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুই চলে আয়, তোর কোনো পয়সা খরচা লাগবে না। আমার বাড়িতে থাকবি।

ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসে নির্মলবাবু একটা মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সিঙ্গাপুর…অনেক দূর!

টাক-মাথা ভদ্রলোকটি এই সব কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে কাগজ ফেলছিলেন, এবার তাঁর ফাইলটা শেষ হয়ে গেল। সারা মেঝেতে কাগজ ছড়ানো। হাতে লেখা বা টাইপ করা সব দরখাস্ত মনে হচ্ছে।

তিনি পা দিয়ে কাগজগুলো ঠেলে ঠেলে এক কোণে সরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, স্যার। যাই!

নির্মলবাবু মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিলেন।

মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, কই রে, তুই যে চা দিতে বললি, এখনো দিল

না তো ?

নির্মলবাবু বললেন, সাধারণত পঁয়তিরিশ মিনিটের আগে ওরা চা দেয় না। কখনো কখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিটও লাগিয়ে দেয়। এই জন্যই ভিজিটররা এলে আমি চায়ের কথা বলিই না, তা হলে তারাও অতক্ষণ বসে থাকে। তবু এক একবার মুখ ফস্কে চায়ের কথা বেরিয়ে যায়।

মেজমামা বললেন, আসুক চা, আমাদের তাড়া নেই। তুই সিঙ্গাপুরে চলে আয়, ওখানে চিকিৎসা করালে তুই নির্ঘাৎ দু ইঞ্চি হাইট ফিরে পাবি। হ্যাঁ, একটা কাজের কথা বলে নি। এই যে একে দেখছিস, এ আমার ভাগ্নে। আপন ছোড়দিব ছেলে। এর জন্য তোকে একটা চাকরির ব্যবস্থা ·

নির্মলবাবুব বুকে যেন একটা গুলি লাগলো। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ, ওপবে দু'হাত তুলে আর্তগলায় বললেন. অ্যাঁ ? কী বললি ? কী বললি ?

হঠাৎ চেয়ার উল্টে নির্মলবাবু সটান পড়ে গেলেন মাটিতে। দড়াম করে শব্দ হলো, ওঁর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ কবে আওয়াজ বেবোতে লাগলো।

আমি আব মেজমামা উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি যে উনি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন, শরীর একটুও নড়ছে না, দু'চোখ বোজা।

চোখের নিমেষে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল নাকি ভদ্রলোকের ?

চেয়ার উল্টে পড়ার আওয়াজে সেই টাক-মাথা ভদ্রলোক, বাইরেব ছোকরাটি ও দু'জন আর্দালি ছুটে এলো। একজন একটা জলের জগ নিয়েই এসেছে হাতে।

টাক-মাথা ভদ্রলোকটি বললেন, এই রে, স্যারের আবার ফিট হয়েছে। এই সুরেন, চোখে মুখে জল ছেটাও, জল ছেটাও !

তারপর তিনি মেজমামার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আপনারা চাকরির কথা কিছু বলেছেন ? জানেন না, চাকরি শব্দটা শুনলেই উনি অজ্ঞান হয়ে যান ?

আমাব অমন জাঁদরেল মেজমামা, তিনি পর্যন্ত বেশ ঘাবড়ে গেছেন ব্যাপার-স্যাপার দেখে। মিনমিন করে বললেন, আজ্ঞে, তা আমি কী করে জানবো !

নির্মলবাবুর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হলো পুরো জামাটা। পাখাটা ফুল স্পিড করা হলো।

ঘরের এক পাশে একটা ডিভান রয়েছে। নির্মলবাবুকে ওরা ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিল তার ওপরে।

টাক-মাথা ভদ্রলোক বললেন, এখানে আধ ঘণ্টা শুয়ে থাকুন, স্যার। বিশ্রাম

নিন। কেউ আপনাকে ডিসটার্ব করবে না।

নির্মলবাবু একবার চোখ মেলে অসহায়ভাবে মেজমামার দিকে তাকালেন।

মেজমামা বললেন, এখন একটু ভালো ফিল করছিস তো নির্মল? কষ্ট হচ্ছে না তো? তোকে আমি সিঙ্গাপুর নিয়ে যাবোই।

নির্মলবাবু প্রায় ফিসফিস করে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, চায়ের আশায় বসে থাকিস না, পিণ্টু, আজ বোধ হয় দেবেই না। আর চাকরি, সব শেষ! ওরে, আমাদের জেনারেশনেই লোকে লাস্ট চাকরি পেয়েছে, আর কোনো চাকরি নেই, আর হবেও না, এই জেনারেশনে কেউ চাকরি পাবে না···আর হবে না···কেউ পাবে না···কেউ পাবে না···কেউ পাবে না···

মেজমামা বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোকে এখন ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হবে না। আমি পরে আসবো।

একজন আর্দালি আমার পিঠে হাত দিয়ে এর মধ্যে ঠেলতে শুরু করেছে, মেজমামাও বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কেমন যেন গুম মেরে গেছেন।

জিপে ওঠার পর খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বললেন, নিমকহারাম! এক কাপ চা পর্যন্ত দিল না।

তারপর আমার পিঠে এক চাপড় মেরে বললেন, চীয়ার আপ! কুছ পরোয়া নেই। আর এক জায়গায় যাবো! এই নির্মলটা আগে কত স্মার্ট আর ফুর্তিবাজ ছিল। এখন এত দুর্বল হয়ে গেছে কেন জানিস? ডিম খায় না! ঐ যে একসময় আমাকে বললো, কোলেস্টেরলের ভয়ে ডিম খায় না, শুনিসনি? এ দেশে আমি যতগুলো অফিসার টাইপের লোকজনদের মীট করেছি, কেউ ঐ ভয়ে ডিম খায় না। আরে রোজ অন্তত দুটো করে ডিম না খেলে কোনো জাত উন্নতি করতে পারে? ডিম খায় না, তাই খাটতে পারে না। খাটে না, তাই কোলেস্টেরল হয়! হুঁ, যত্ত সব!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, মেজমামা উনি সত্যিই বেঁটে হয়ে যাচ্ছেন?

মেজমামা বললেন, নিজের চোখেই দেখলুম। অবিশ্বাস করি কী করে?

ড্রাইভারকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবার আমাকে মেজমামা বললেন, এবার কার কাছে যাবো জানিস? রথীন তালুকদার। ফেমাস লোক। তুই রথীনের নাম শুনিসনি?

রথীন তালুকদার নামটা আমার চেনা চেনা মনে হলো। খবরের কাগজে

দেখেছি বোধ হয়। কিন্তু কিসে তিনি বিখ্যাত, তা মনে পড়ছে না। আমি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটা পারতপক্ষে পড়ি না। রোজই তো প্রথম পাতায় শুধু খুনো-খুনি আর গালাগালি ছাড়া আর কিছু থাকে না। শেষ পাতার খেলার খবরটা আমার বরাবর ভালো লাগতো, কিন্তু এখন সেখানেও দেখি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মেজো মন্ত্রী, সেজো মন্ত্রীর মতন সবাই সবাইকে চোর বলতে শুরু করেছে। আজ-কাল দেখছি, চোর-চোর খেলাটাই সব চেয়ে জনপ্রিয় খেলা!

রথীন তালুকদারের নামটা খবরের কাগজে প্রথম পাতায় দেখেছি, না শেষ পাতায়, তা অবশ্য মনে পড়ছে না।

মেজমামা বললেন, রথীন আমাদের আমলেই নাম-করা ছাত্র নেতা ছিল। এখন বেশ বড় দরের পলিটিক্যাল লিডার। ওরা এখন রুলিং পার্টি। রথীন ইচ্ছে করলেই মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারতো, কিন্তু পার্টি সংগঠনের কাজ নিয়ে আছে। কতখানি স্বার্থ-ত্যাগ করেছে, বল? ছোটবেলা থেকেই রথীন খুব আইডিয়ালিস্ট। এক সময় আমি রথীনের দু-চারটে উপকার করেছি, ও নিশ্চয়ই মনে রেখেছে।

আমার পিঠে আর একটা চাপড় মেরে আরও খানিকটা উৎসাহের সঙ্গে মেজমামা বললেন, আজকাল বুরোক্রাটদের তুলনায় পলিটিশিয়ানদের ক্ষমতা অনেক বেশি। ওরা ফোন তুলে একটা কথা বললেই বুরোক্রাটরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। রথীন এইরকমভাবে একটা তুড়ি দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোর চাকরি হয়ে যাবে।

মেজমামা নিজেই চটাং চটাং করে তুড়ি দিতে লাগলেন।



পার্টি অফিসটায় নতুন রং করা হয়েছে। কাছে গেলেই গন্ধ পাওয়া যায়। কলকাতার অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে এই বাড়িটার একটা বিশেষ তফাৎ এই যে, এর দেয়ালে কোনো পার্টির শ্লোগান লেখা নেই।

সামনে দু-তিনটি গাড়ি ও অনেকগুলি স্কুটার-সাইকেল। বেশ লোকজনের যাওয়া-আসার ব্যস্ততা।

আমার মাথার মধ্যে চিড়িক চিড়িক করে ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল।

এই রে, ব্যথাটা হঠাৎ খুব বেড়ে যাবে নাকি? ব্যথাটা আরম্ভ হলেই পা-দুটো দুর্বল লাগে. শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এখন এলেবেলে কথা শুনতে হবে কতক্ষণ তা কে জানে।

মূল দরজাটার ঠিক পাশেই দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা. মাথার চুল খোলা. একটু আগেই বৃষ্টিতে ভিজেছে বোধ হয়, মুখে কয়েক ফোঁটা জলের বিন্দু।

মেয়েটি সোজা চেয়ে আছে আমার দিকে। দিন-দুপুরে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো।

কাল রাত্তিরে ছাদে এই মেয়েটিকেই দেখেছিলুম না? তখন বৃষ্টি ও অন্ধকার ছিল. বিদ্যুৎ চমকে একবার মাত্র দেখা গিয়েছিল। আমার দিকে চেয়ে হাসছিল সে। না. ছাদে সত্যিকারের কোনো মেয়ে ছিল না। ওটা আমার চোখের ভুল। দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎচমকে আর তাকে দেখা যায় নি। এমন চোখের ভুল আমার আগে কখনো হয়নি, আমি কোনোদিন ভূত বা পেত্নী দেখিনি।

কিন্তু কাল রাত্তিরে ছাদে অবিকল রক্ত মাংসের মানবীর মতন একজনকে দেখেছিলাম. এটাও যেমন ঠিক, আবার একটু পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এটাও ঠিক। আমি ছিলুম সিঁড়ির দরজার দিকে, সুতরাং সেখান দিয়ে কোনো মেয়ের চট করে নেমে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং কাল্পনিক নারী হতে বাধ্য। যদিও বৃষ্টির মধ্যে ছাদের পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো একটি মেয়েকে আমি

খামোখা কল্পনা করতে যাবো কেন, তাই-ই বা কে জানে!

সেই কাল্পনিক মেয়েটির সঙ্গে এই নীল শাড়ি পরা মেয়েটির মুখের আশ্চর্য মিল। এ মেয়েটি তো আর অবাস্তব হতে পারে না। এখন পৌনে বারোটা বাজে, সদ্য বৃষ্টি থেমে এক ঝলক রোদ উঠেছে। সেই রোদ পড়েছে মেয়েটির মুখে। ওর ব্লাউজের রং লাল, চটির রং লাল, তার কানেও দুটি লাল পাথরের দুল, এগুলো কি কল্পনা হতে পারে নাকি?

মেয়েটি সোজাসুজি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওকি আমাকে চেনে? হাসি হাসি মুখ করে আছে। আমি চট করে মাথা ঘুরিয়ে একবার পেছনটা দেখে নিলুম, হয়তো অন্য কারুর দিকে চেয়ে ও হাসছে। কিন্তু আমার ঠিক পেছনে কেউ নেই।

পৃথিবীতে কত মেয়েকে দেখলে মনের ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করে, ব্রাউনিং-এর কবিতার মতন বলতে ইচ্ছে করে, তোমার সমগ্র জীবন থেকে আমাকে একটি মাত্র মুহূর্ত দাও! বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বলা হয় না। অচেনা কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করার বিন্দুমাত্র প্রতিভা নেই আমার।

মেজমামা ভেতরে ঢুকে গিয়েও মাথা ঘুরিয়ে বললেন, এই নীলু, কী হলো, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, কেটে পড়বার মতলোবে আছিস নাকি?

মেজমামা ফিরে এসে হাত ধরে টানাটানি করবেন, এই ভয়ে আমাকেও ভেতরে ঢুকে পড়তে হলো। মেয়েটি একটু যেন কৌতুকের হাসি দিল সেজন্য।

মেজমামা একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, রথীন তালুকদারকে কোথায় পাবো?

লোকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললো, রথীনদা? চলে যান, দোতলায় উঠে ডান দিকের বারান্দায় প্রথম দু'খানা ঘর ছেড়ে···।

দোতলায় উঠে দেখা গেল একটা টানা বারান্দা। অনেকগুলো ঘর। আর একটি লোককে জিজ্ঞেস করতে সেও একই রকম ভাবে বললো, রথীনদা? ঐ যে দরজাটা এক পাল্লা খোলা দেখছেন··।

সেই ঘরের মধ্যে অনেক লোকজন, নানারকম গুঞ্জন। দরজার কাছে পাহারাদারের ভঙ্গিতে একজন যুবক দাঁড়িয়ে। রথীন তালুকদারের নাম শুনে বললো, চলে যান ভেতরে, ঐ যে মাঝখানে বসে আছেন!

নির্মল পত্রনবীশের ঘরে লোকজন বিশেষ ছিল না, তবু আমাদের আটকানো হচ্ছিল। এখানে কেউ কোনোরকম বাধা দেয় না।

ঘরের মধ্যে চেয়ার টেবিল নেই, একটা নীচু চৌকির ওপর ফরাস পাতা।

একজন মাঝবয়েসী, মাঝারি স্বাস্থ্যের লোককে ঘিরে বসে আছে দশ-বারোটি নারী পুরুষ। ভদ্রলোকের দু' পাশে দুটি লাল ও নীল টেলিফোন, তিনি অনেকের সঙ্গেই পর্যায়ক্রমে কথা বলছেন, আবার মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলছেন।

চৌকিটার কাছে গিয়ে এখন দাঁড়ালেও তিনি আমাদের দিকে তাকালেন না। মেজমামা দু'বার গলা খাঁকারি দিলেন, তাতেও কোনো কাজ হলো না।

অসহিষ্ণু ভাবে মেজমামা বললেন, রথীন, কেমন আছিস? তাকিয়ে ছাখ কে এসেছে!

ভদ্রলোক এবারেও মেজমামার দিকে না তাকিয়ে বললেন, হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে!

মেজমামা আবার বললেন, রথীন তালুকদাব, মস্ত বড লিডাব, একবার মুখখানা তোলো বাপ!

ভদ্রলোক বললেন. লিডাব আবার কি! জনগণই সব শক্তিব উৎস!

ধৈর্য হারিয়ে মেজমামা হেঁকে বললেন, অ্যাই রথীন! তোদের নামে আমি মামলা করবো। ব্যাটা গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছিস তোবা, আব রাস্তায় ইয়া বড বড গর্ত। নর্দমা. হাইড্র্যাণ্টের ঢাকনা নেই, কত লোকের পা ভাঙছে, আমারই তো পা মচকে গেছে, এব ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

ঘরের অন্য সকলে এক নিমেষে চুপ কবে গেছে। রথীন তালুকদার মুখ তুলে প্রশ্রয়ের হাসি দিলেন একটা। তারপর ভাবগম্ভীব স্বরে বললেন, সমাজ-দেহেব সারা জায়গায় এত ক্ষত, আর আপনি সামান্য রাস্তার গর্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? আগে আসুন, আমরা সবাই মিলে সমাজটাকে বদলাই, সুস্থতা ফিরিয়ে আনি, তারপর রাস্তা সারাবার কথা ভাবা যাবে।

কথাগুলো তিনি বললেন আবৃত্তিব স্বরে। আগে থেকে তৈরি করা এবং অনেকবার বলতে হয়, তা শুনলেই বোঝা যায়।

বলা শেষ কবেই তিনি অন্য একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। ঐ বস্তিতে কত ভোটার বললে? সাড়ে তিন শো! কতজন মেল, কতজন ফিমেল?

মেজমামা এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, অ্যাই রথীন, একবার তাকিয়ে দ্যাখ ভালো করে কে এসেছে। আমি পিণ্টু। চিনতে পারছিস না নাকি? আমার তো নির্মলের মতন চেহারা পাল্টায় নি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনতে পারবো না কেন? বসুন. বসুন। আপনার বাবা কেমন আছেন?

—বাবা ? আমার বাবা তো কেটে পড়েছেন চোদ্দ বছর আগে। আমার বাবার শ্রাদ্ধে তুই নেমন্তন্ন খেয়েছিলি মনে নেই ?

—আপনাদের ওখানকার পার্টি অফিসটা বড় করতে হবে। একটা ঘর না বাড়ালেই নয়।

—অ্যাঁ, পার্টি অফিস ? আমাদের ওখানে কোনো পার্টিই নেই।

—আপনারা কত চাঁদা তুলতে পারবেন ?

—চাঁদা ? সিঙ্গাপুরে কেউ চাঁদা তুলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জেলে ভরে দেবে।

এবার আমি লক্ষ্য করলুম, রথীন তালুকদার সামান্য লক্ষ্মী ট্যারা। উনি মেজমামার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কথা বলছেন পাশের লোকটির সঙ্গে। মেজমামা একরকম উত্তর দিচ্ছেন, পাশের লোকটিও অন্যরকম উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

রথীন তালুকদার আবার মেজমামার দিকে চেয়ে থেকেই বললেন, বুর্জোয়া শোষণ ব্যবস্থা আর সাম্প্রদায়িকতা, এই দুটোর বিরুদ্ধে আমাদের সব সময় লড়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, পার্টি মেম্বার মানেই প্রত্যেকে এক একজন অতন্দ্র প্রহরী!

মেজমামা এবার খুব রেগে গিয়ে প্রবল গলা চড়িয়ে বললেন, তখন থেকে আমার ওপর বড় বড় বুকনি ঝাড়ছিস যে বড়। আমি পিণ্টু, আমাকে তুই চিনিস না ? শালা, আমাকে না-চেনার ভান করছিস ? চ্যালা-চামুণ্ডা নিয়ে বসে আছিস বলে এতক্ষণ কিছু বলিনি। এবার মারবো এক থাবড়া ? খুব বড় নেতা হয়েছিস, না ?

মেজমামা সত্যি সত্যি মারার জন্য হাত তুললেন। আমি প্রমাদ গণলুম। চ্যালাদের কাছে ছুরি কিংবা বোমা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আজকাল যে-কোনো পার্টির চ্যালাদেরই প্রথম যোগ্যতা ছুরি কিংবা বোমা চালাতে জানা। মেজমামা একা শুধু গায়ের জোরে কী করবেন ?

অন্য নারী পুরুষরা একসঙ্গে গুনগুন করে কী যেন বলে উঠলো। দু'জন উঠে দাঁড়ালো। রথীন তালুকদার বাঁ হাত তুলে তাদের নিবৃত্ত করে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন মেজমামার দিকে। তারপর তিনিও হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, পিনাকপানি! পিনাকপানি! তাই বল। তখন থেকে পিণ্টু পিণ্টু করছিস কেন ? পিনাকের মতন গলাটা চড়ালি বলেই তো চিনতে পারলুম। রোজ এখানে অন্তত পাঁচজন করে পিণ্টু আসে। খুব কমন নাম। পিণ্টু, হেবো, বঙ্কা, গুল্লু এইসব নামেই আজকাল এরা অনেকে নিজেদের পরিচয় দেয়, ভালো নাম-টাম

কেউ বলে না। তারপর পিনাক, তোর কী খবর বল? তুই এখন দুর্গাপুরেই আছিস?

মেজমামা আবার ভুরু কুঁচকে বললেন. দুর্গাপুরে? আমি আবার সেখানে ছিলুম কবে. আমি তো থাকি সিঙ্গাপুর।

রথীন তালুকদার বললেন, ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা দাঁড়া এক মিনিট।

তিনি অন্য একজনের দিকে ফিরে বললেন, এই তোদের পাড়ার দেওয়ালগুলো অন্য পার্টি ক্যাপচার করলো কী করে? দেয়াল একদম ছাড়া চলবে না। দেয়াল দখলটাই আসল লড়াই। দেয়াল আমাদেব চাই।

আর একজনকে বললেন, গুল্লু. তোদের ওখানে আবো হকার বসা। রাস্তার দুধারে মোটে পঁচিশ তিরিশটা হকার দেখলুম সেদিন। অন্তত দেড়শোজন হকার না হলে স্ট্রং ইউনিয়ন হবে না। আরও হকার ডেকে এনে পুরো ফুটপাথ ঢেকে দে!

আর একজনকে বললেন. তোমাদের ওখানে খালের ওপর একটা ব্রীজ চাই? হ্যাঁ, ছোটখাটো একটা কাঠের ব্রীজ আপাতত দরকার সেটা আমিও দেখে এসে বুঝেছি। মিউনিসিপ্যালিটিকে বলে এক্ষুনি একটা ব্রীজ বানিয়ে দিতে পারি। পি ডবলু ডি-র ফাণ্ড থেকেও দেওয়া যেতে পাবে কিছু টাকা। কিন্তু ব্রীজের ওপারটায় কারা থাকে? সব অন্য পার্টির সাপোর্টার। গতবার আমাদের এগেইনস্টে ভোট দিয়েছে। দেয়নি? ঐসব হারামজাদা. নিমকহারামদের জন্য গভর্নমেন্টের পয়সা খর্চা করে ব্রীজ বানানো হবে? আমরা ব্রীজ বানাবো. ওরা মজা লুটবে? ওসব চলবে না! আমাদের ক্যাডাররা গিয়ে বলুক, ওরা যদি পরের বার আমাদের ভোট দেয়, তবেই ব্রীজ পাবে।

আবার তিনি মেজমামার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ. আপনার কী চাই বলুন!

মেজমামা তড়পে উঠে বললেন, ফের ন্যাকামি হচ্ছে? আমার সঙ্গে আপনি আপনি?

রথীন তালুকদার বললেন, ওঃ হো! পিনাকপানি! বড্ড ভুলে যাইরে আজকাল। এত কাজ, এত লোকজন আসে, কোন দিকটা সামলাবো!

মেজমামা বললেন, তোর বড্ড ভুলো মন বরাবরই। ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময় তোকে পাঁচশো টাকা ধার দিয়েছিলুম, সেটাও ভুলে মেরে দিয়েছিস! কোনোদিন ফেরৎ দিসনি।

—না, না। সেটা ভুলবো কেন? তোর কাছে বেশি টাকা ছিল তুই দিয়েছিস!

আমার অভাব ছিল, আমি নিয়েছি। এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই না? এর মধ্যে আবার ফেরৎ দেবার কোশ্চেন আসছে কোথা থেকে?

—আমার বেশি টাকা ছিল? তুই পরীক্ষার ফি জোটাতে পারিসনি বলে আমি আমার মেডেল বিক্রি করে দিইনি? সে থাকগে, টাকা চাইতে আসিনি আমি, ভয় নেই। সেই টাকার চিন্তাতেই তুই আমাকে না চেনার ভান করছিলি?

—আরে না, না, তোকে চিনবো না কেন?

—আমার বাবা ছোটবেলা থেকে তোকে পড়িয়েছেন। আমাকে একটা জামা কিনে দিলে তোকেও একটা জামা দিতেন। বাবা মারা যাবার সময় তুই হাউ হাউ করে কেঁদেছিলি! শ্রাদ্ধের দিন কত খাটাখাটনি করলি। সেই তুই আজ আমায় ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করছিস, বাবা কেমন আছে? বড় নেতা হলে বুঝি এইসব কথা ভুলে যেতে হয়?

রথীন তালুকদার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সব এবার যাও। আমার এক পুরোনো বন্ধু এসেছে, এর সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে উঠে গেল।

একটু পরেই একজন এসে বড় ভাঁড়ে চা দিয়ে গেল।

মেজমামা আর রথীন তালুকদার মেতে উঠলেন পুরোনো কালের গপ্পে। আমি আর কান দিলুম না সেদিকে।

বাইরে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়ানো মেয়েটি আমার দিকে চেনা-চেনা চোখে তাকিয়েছিল। ওকে কি আমি আগে কোথাও দেখেছি? কোথাও পরিচয় হয়েছিল? একটি সুশ্রী তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলে তাকে আমি ভুলে যাবো, এও কি সম্ভব?

মেয়েটি কি এখনো দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে?

বাথরুমে যাবার নাম করে একবার দেখে এলে হয় না? এরা দুই বন্ধু তো এখন গল্পে মত্ত। আমার মাথার ব্যথাটা কমে গেছে কখন যেন। চায়ের পরে সিগারেটেও দু-একটান দিয়ে আসা দরকার।

উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মেজমামা বললেন, শোন রথীন, এবার একটা কাজের কথা বলে নিই। তোর কাছে এসেছি একটা চাকরির জন্য।

রথীন তালুকদার বলেন, সে কি, তুই এখনো চাকরি করিস না? এত বয়েস পর্যন্ত বেকার? এতদিন আমাকে কোনো খবর দিসনি কেন?

মেজমামা চোখ পাকিয়ে বললেন, আমার জন্য বলছি না, ইডিয়েট। সিঙ্গাপুরে

কি আমি ভ্যারেণ্ডা ভাজি ? আমার এই ভাগ্নেটার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তোদের হাতে তো এখন অনেক ক্ষমতা।

রথীন তালুকদার এই প্রথম আমাকে দেখলেন। এতক্ষণ যে তাঁর বাল্যবন্ধুর পাশে আর একজন মানুষও বসে আছে, তা তিনি লক্ষ্যই করেননি।

মেজমামা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, এই হচ্ছে আমার ভাগ্নে, নীলু। পড়াশুনোয় খুব একটা ভালো ছিল না। স্বভাবটাও বাউণ্ডুলে টাইপের। তবে মাঝারি চাকরির জন্য তো বেশি কিছু কোয়ালিফিকেশান লাগে না। বসিয়ে দে কোনো একটা পোস্টে।

রথীন তালুকদার জিজ্ঞেস করলেন, বয়েস কত ?

মেজমামা বললেন, চব্বিশ-পঁচিশ হবে, তাই না রে নীলু ?

আমি শুকনো গলায় বললুম, সাতাশ।

রথীন তালুকদার জিজ্ঞেস করলেন, কোন পার্টিতে আছে ?

মেজমামা আমার দিকে ফিরে বললেন, তুই কোনো পার্টি ফার্টি করিস নাকি ?

আমি দু দিকে মাথা নাড়লুম।

রথীন তালুকদার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তা হলে তো ভাই আমি কিছু করতে পারবো না। আমাদের পার্টি ওয়ার্কার ছাড়া তো কারুকে চাকরি দেওয়া যাবে না।

মেজমামা বললেন, সে কি রে ? সোজাসুজি এই কথা বললি ? সরকারি চাকরি তা শুধু তোদের পার্টির ওয়ার্কাররা পাবে কেন ? সরকার আব পার্টি কি এক ?

রথীন তালুকদার বললেন, এতে অবাক হবার কী আছে রে, পিণ্টু ? দেশে যখন আলাদা আলাদা পার্টি আছে, তখন যে-পার্টি যখন ক্ষমতায় আসবে, সেই পার্টি তখন নিজের পাতে যত বেশি পারে ঝোল টানবে, চাকরি-বাকরিগুলো নিজেদের ওয়ার্কার দিয়ে ভরাবার চেষ্টা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক, সব দেশেই এরকম হয়।

—তুই কটা দেশের খবর রাখিস রে ? ইংল্যাণ্ডে রুলিং পার্টি এরকম ফেভারিটিজম দেখাবার চেষ্টা করলে গভর্ণমেণ্ট ফল করে যায়। ফ্রান্সে একবার···

—ঠিক আছে, অন্য দেশের কথা বাদ দে। আমাদের দেশে এরকমই সিসটেম। ইণ্ডিয়ার অন্য স্টেটগুলোতে ছাখ না ! এমনকি সেনূট্রাল গভর্ণমেণ্টেও কি আমাদের পার্টির কেউ চাকরি পাবে ? পুলিস এনকোয়ারি করে নাকচ করে দেবে ! ওরা ওদের পার্টির লোকদের চান্স দেয়, আমরাও আমাদের পার্টির ওয়ার্কারদের চান্স

দেবো। সোজা কথা।

—তা হলে যে-সব ছেলেমেয়ে এ পার্টিতেও নেই, ও পার্টিতেও নেই, তারা কোথায় যাবে ?

—তারা ফরেনে চলে যাবে। তারা ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় চাকবি করতে চলে যায়।

—এ কী সর্বনেশে কথা বে ! সব ছেলেমেকেই পার্টি পলিটিক্স করতে হবে ? তা হলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াব, কবি, শিল্পী, গায়ক এসব হবে কারা ? চীন-রাশিয়াতেও তো সব ছেলেমেয়ে পার্টি মেম্বার হয় না।

—আমরাও হতে বলছি না।

—তা হলে যে চাকরি পাবে না বলছিস ?

—শোন, পিণ্টু, রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে না, 'ঘবেও নাহি, পারেও নাহি. যে-জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে লয় তারে…।' কে ডাকে বল তো ? কেউ ডাকে না। সে নিজের চেষ্টায় যা পারে করবে। আমি তোর ভাগ্যেব জন্য কিছু কবতে পারবো না।

মেজমামা এক মিনিট থুতনি চুলকোতে চুলকোতে চিন্তা করলেন।

তারপর আমার ঘাড়ে আর একখানা চাপড মেরে বললেন, কুছ পরোয়া নেই। নীলু, তুই রথীনদেব পার্টির ওয়ার্কাব হয়ে যা। তা হলে প্রবলেম সল্‌ভড হয়ে যায়। কী রে, রথীন, ও এখন ওয়ার্কার হতে পাবে না ?

—তা হতে পারে। কোনো অসুবিধে নেই।

—কী কী করতে হবে ? কোনো খাতায় নাম লেখাতে হয় ?

—সে সব আমি ব্যবস্থা করে দেবো।

—নীলু, তুই তা হলে আজ থেকেই লেগে যা।

আমি ডান হাতটা তুলে বললুম, আমি কি…আমি তো বোমা বাঁধতে জানি না। কালীপুজোর সময় তুবড়ি বানিয়েছিলুম একবার।

রথীন তালুকদার ধমক দিয়ে বললেন, বোমা-টোমা আবার কি ! ওসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। বোমা বানাবার অনেক লোক আছে। আমাদের চাই আদর্শ কর্মী। ডেডিকেটেড ওয়ার্কার। বইটই পড়ে নিতে হবে। তোমাদের পাড়ার লোকাল কমিটিকে আমি জানিয়ে দেবো ওরাই যোগাযোগ করবে তোমার সঙ্গে।

মেজমামা উল্লাসের সঙ্গে বললেন, দ্যাট সেট্‌লস ইট। গুড, ভেরি গুড। থ্যাঙ্ক

ইউ, রথীন, বড্ড উপকার করলি। তা হলে আমার ভাগ্নেটাকে কী চাকরি দিচ্ছিস?

—চাকরি? চাকরি এক্ষুনি কি?

—এই যে বললি পার্টি ওয়ার্কার হলেই চাকরি পাবে?

—সঙ্গে সঙ্গে? এ কি মামাবাড়ির আবদার নাকি রে? তা হলে তো চাকরি পাবার লোভে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ছুটে এসে বলবে, পার্টি ওয়ার্কার হবো! এতই সোজা? দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার। সবাইকে কি চাকরি দিতে পারবো? যারা আমাদের পার্টির সত্যি সত্যি সিনসিয়ার ওয়ার্কার হবে, সেটা প্রুভ করবে, তাদেরই জন্য চাকরির ব্যবস্থা করবো।

—সেটা প্রুভ করতে কতদিন লাগবে? ততদিন এই বেকারগুলো খাবে কি? নীলুকে তুই কতদিন পরে চান্স দিবি?

—ওকে লাইনে থাকতে হবে। যারা আগে এসেছে, তারা আগে চান্স পাবে। ওর নম্বর হবে পাঁচ হাজার সাতশো তিরাশি।

—তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস, রথীন! অতগুলো লোকের পর চান্স পেতে পেতে তো আমার ভাগ্নেটা বুড়ো হয়ে যাবে। কিংবা ওর টার্ন আসবার আগে মরেই যাবে হয়তো।

—আর একটা উপায় হচ্ছে, পাঁচ হাজার সাতশো তিরাশি টাকা চাঁদা যদি দিতে পারে।

—ঘুষ? চাকরির জন্য ঘুষ?

—ঘুষ নয়, চাঁদা। পার্টি ফাণ্ডে।

—ছ্যাখ রোথো, আমার সহ্যের একটা সীমা আছে। তুই আমার ভাগ্নের একটা চাকরির জন্য আমার কাছে ঘুষ চাইছিস?

—ঘুষ নয় ভাই, পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা! কোন্ পার্টি এভাবে চাঁদা তোলে না বলতো? সবাই তোলে।

—যে পার্টিই তুলুক। স্বেচ্ছায় দিলে তাকে বলা যায় চাঁদা। প্রেসার দিয়ে আদায় করলে তাকেই বলে ঘুষ! হারামজাদা, তুই কতদিন আমাদের বাড়িতে খেয়েছিস, থেকেছিস, ঘুমিয়েছিস, এখন তুই আমার ভাগ্নের একটা চাকরির বদলে ঘুষ চাইছিস।

—তুই শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছিস পিণ্টু। পার্টির নীতি কিংবা নির্দেশ আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। এখানে আমি ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তাকেও

প্রশ্রয় দিই না। তুই সিঙ্গাপুরে বড় চাকরি করিস, এই কটা টাকা দিতে তোর এমন কি অসুবিধে হবে ?

—এক পয়সাও দেবো না। অন প্রিন্সিপাল দেবো না! চল নীলু, তুই সারাজীবন বেকার থাকবি তাও সই, তবু খবর্দার মাথা নোয়াবি না! পলিটিক্সের নিকুচি করেছে! চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই, আমার কাছে এই রোথোটা ঘুষ চাইলো!

—কেন বারবার ঘুষ ঘুষ বলছিস। পিণ্টু? আমি নিজের জন্য চেয়েছি? বলছি না পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা।

—তোর ডিকশানারিতে যেটা চাঁদা, আমার ডিকশানারিতে সেটাই ঘুষ! পাঁচ হাজার সাতশো তিরাশি! একেবারে অঙ্কের হিসেবের মতন।

—রাউণ্ড ফিগার কেন বলা হয় না জানিস? সেটা বড্ড মারোয়াড়ি মারোয়াড়ি শোনায়।

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে, জিভ কেটে রথীন তালুকদার বললেন, সরি, সরি! অফ দা রেকর্ড। মারোয়াড়ি কথাটা আমি উচ্চারণ করতে চাইনি। শ্লিপ অফ টাং। কোনো বিশেষ কমিউনিটির বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না। মারোয়াড়িদের বিরুদ্ধেও আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমি বলতে চাইছিলাম, পাঁচ হাজার দশ হাজার এইরকম ডোনেশন বড বড ব্যবসায়ীরা যখন তখন দিতে পারে। কিন্তু পাঁচ হাজার সাতশো তিরাশি, এরকম ফিগার শুনলেই মনে হয়, একজন মেহনতী মানুষ অনেক কষ্ট করে টাকাটা জোগাড করেছে, শেষ সম্বলটাও পার্টিকে দিয়েছে।

মেজমামা মুখ ভেংচে বললেন, শুনলে এরকম মনে হয়? আর একজন বেকার এই টাকাটা জোগাড করবে কী করে?

—কষ্ট করতে হবে! পার্টির জন্য দিচ্ছে। পার্টিকে ষ্ট্রং করতে হবে। তুই আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিস পিণ্টু, এক সময় তুই আমার অনেক উপকার করেছিস, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনো কিছু করতে পারি না। পার্টির স্বার্থ আমাকে সব সময় দেখতেই হবে!

—তুই কোনো চাকরি বাকরি করিস, রথীন? না তুইও বেকার?

—বেকার মানে? আমি সারাক্ষণই এই কাজ করি। আমি পার্টির হোল-টাইমার!

—ভাবের ঘরে আর কতদিন চুরি করবি, শালা! পার্টির স্বার্থ মানেই তোর ব্যক্তিগত স্বার্থ। চাঁদার টাকায় এরকম বড বড় বাড়ি হবে। তোর মতন নেতারা পাশে দু'খানা টেলিফোন নিয়ে অন্যদের লেকচার মেরে যাবে। মাথার ওপর

পাখা, যখন তখন চা। তোর খাওয়া পরার খরচও পার্টি দেয়। পার্টি তোকে গাড়ি দেয়নি? আরও চাঁদা তোল, গাড়ি পাবি।

—তুই বুঝতে পারছিস না, পিন্টু। সব পার্টিতেই হোল টাইমার থাকে, আমি যদি…

—আমার আর বোঝার দরকার নেই! গুড বাই! এককালের ছাত্র বিপ্লবী এখন চাঁদা তোলার যন্ত্র।

মেজমামা গটমট করে বীর দর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেও তাঁর মুখখানা অপমানে ও ক্ষোভে কালচে হয়ে গেছে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে নামতে লাগলুম। মেজমামার এই পরাজয় দেখার আনন্দ আমি আর চেপে রাখতে পারছি না। বাড়ি ফিরে বৌদিকে সব রসিয়ে বলতে হবে। তারপর দু'জনে মিলে মেজমামাকে যা নাস্তানাবুদ করবো আজ বিকেলে।

বাইরে এসেই বাঁ দিকে তাকালুম। না, সে মেয়েটি নেই। এতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেই বা কেন সে? মেয়েটি কি এখানে কারুর জন্য প্রতীক্ষা করছিল?

মেজমামা বিরস মুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিপটা খুঁজতে লাগলেন।

আমি বললুম, আর কি কোথাও যাবার দরকার আছে? এবার বাড়ি ফিরলে হয় না?

মেজমামা বললেন, সত্যি রে, নীলু, চাকরির বাজার যে এমন টাইট, ভাবতেই পারিনি। রথীনটার ওপর খুব ভরসা করেছিলুম, কিন্তু ও এমন বদলে গেছে! বন্ধুত্ব টন্ধুত্বর কোনো দাম নেই, সবই এখন পার্টি!

—মেজমামা, উনি তো দোষের কিছু বলেননি! সব পার্টিই এইরকম কথা বলে।

—সব পার্টিরই আমি গুষ্টির পিণ্ডি চটকাই! পার্টির বাইরে কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না, সবাইকেই জো-হুজুর হতে হবে! এখন দেখতে পাচ্ছি, তোর কথাটাই ঠিক। এরকম অপমানজনকভাবে চাকরি জোগাড় করার চেয়ে বেকার থাকা ঢের ভালো। যাদের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, কাচ্চা-বাচ্চারা না খেয়ে থাকে, তাদের তো একটা কিছু করতেই হবে। তোর তো সে ঝামেলা নেই, তুই বেশ আছিস, বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। যতদিন তোর দাদা-বৌদি তোকে

খাওয়াবে, তুই এরকমই চালিয়ে যা।

—শুধু শুধু এই বাদলার দিনে তুমি এতটা সময় নষ্ট করলে মেজমামা!

—পুরোনো বন্ধুরা যে এমন পাল্টে যায়, কী করে জানবো? এই রথীন যখন আমাদের বাড়িতে এসে থাকতো, আমরা এক বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছি। আজ সে তোকে চাকরি দিতে পারুক বা না পারুক, একটাও পার্সোনাল কথা বললো না! শুধু বড় বড় লেকচার!

—আকাশ আবার কালো হয়ে এসেছে। চলো, বাড়ি যাই!

—হুঁ! তোর মার কাছে বড় গলা করে বলেছিলুম, তোর একটা চাকরি আমি জোগাড় করে দেবোই! এখন ছোড়দি ঠাট্টা করবে। খালি হাতে ফিরলেই বলবে, দেখলুম পিণ্টু, তোর মুরোদ!

—আমি আর বৌদিও তোমাকে ক্ষ্যাপাবো! সিঙ্গাপুরে থাকো, এ দেশের কিছুই খবর রাখো না।

—তোরাও আমায় ক্ষ্যাপাবি?

—নিশ্চয়ই! তুমি আমার কতটা সময় নষ্ট করলে! তোমার সঙ্গে এসে আমাকেও ফালতু অপমান সহ্য করতে হলো!

—তা হলে তো দেখছি আজই শ্বশুরবাড়ি পালাতে হবে ভন্তুর সঙ্গে। চল, একবার সুরঞ্জনের অফিসটা ঘুরে যাই!

—আবার? দু'খানা বন্ধুর স্যাম্পেল তো দেখলে মেজমামা। সবাই এই রকমই হবে। কেন সাধ করে নিজের মান খোওয়াতে যাবে।

—সুরঞ্জনের অফিসটা কাছেই। শুধু একবার দেখা করে যাবো। ঠিক আছে, চাকরির কথা উচ্চারণও করবো না। তুই ভালো করে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে ফ্যাল। তোর মুখ দেখলেই যাতে বোঝা যায়, তুই চাকরি-ফাকরি কিচ্ছু গ্রাহ্য করিস না।

আবার জিপটায় উঠে বসার পর মেজমামা আবার বললো, এই যে সুরঞ্জন দত্তরায়ের কাছে যাচ্ছি, ওর সঙ্গে আমি স্কুলে পড়েছি। আমার সঙ্গে খুব যে ভাব ছিল তা নয়, বরং রেষারেষি ছিল। ও একবার ফার্স্ট হতো, আমি পরের বার ফার্স্ট হতাম। হ্যাঁ, তুই বিশ্বাস করছিস না, আমি সত্যি সত্যি ফার্স্ট হয়েছি অনেকবার। তা সুরঞ্জন এখন সাকসেসফুল হয়েছে, প্রাইভেট ফার্মে বড় চাকরি করে। কিন্তু ও ঘন ঘন চাকরি বদলায়। এর মধ্যে আট দশ জায়গায় বদলেছে। একটা ছাড়ে, আবার একটা পেয়েও যায় সঙ্গে সঙ্গে।

আমি বললুম, ওপরের দিকের লোকদের চাকরির অভাব নেই। খবরের কাগজে বড বড় বিজ্ঞাপন থাকে। দশ বছর, পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা চায়। যত ঝঞ্ঝাট আমার বয়েসীদের, যাদেব কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা বলো তো, কোনো চাকরি না পেলে অভিজ্ঞতা হবে কী করে? তোমার ঐ প্রথম বন্ধু নির্মলবাবু বললেন না, তোমাদের জেনারেশানের পবে আর কেউ চাকরিও পাবে না!

মেজমামা বললেন, এই স্বরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলেই বাঙালীদের নিন্দে করে। নিজে যে বাঙালী সেটা পর্যন্ত অস্বীকাব করতে চায়। ও বলে, বাঙালীবা কোনো কর্মের না, ফাঁকি মারে, ইউনিয়ানবাজি করে, কথায় কথায় স্ট্রাইক ডাকে, কিন্তু কাজেব বেলায় ঢুঁ ঢুঁ! এমনকি বাঙালী কেবানীরা নাকি ভালো করে ঘুষ নিতেও জানে না। পঞ্চাশ-একশো টাকা ঘুষ নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে। আর নর্থ ইণ্ডিয়ার অফিসগুলোতে যে-কোনো কাজের জন্য যাও, স্ট্রেট দশ পার্সেণ্ট ঘুষ চাইবে, কাজটাও নিখুঁত করে দেবে! ঘুষের ব্যাপাবে তারা অনেস্ট।

—ঘুষেরও অনেস্টি!

—হে-হে-হে-হে! যে বিয়ের যে মন্তর! স্বরঞ্জনের কাছে যাচ্ছি তার কারণ ও আমাকে একটা চিঠি লিখেছে, আসবার ঠিক দু দিন আগেই পেয়েছি। উত্তর দেওয়া হয়নি।

—দশ মিনিটের বেশি বসবো না কিন্তু। তোমরা দেখা হলেই স্কুল-কলেজের বন্ধুদের কথা বলতে শুরু করে দাও, আমার বোরিং লাগে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

থিয়েটার রোডে গিয়ে আবার একটা সরু রাস্তায় ঢুকে স্বরঞ্জন দত্তরায়ের অফিস। এখানকার এক একটা বাড়িতেই অনেকগুলো অফিস থাকে। এদের কম্পানিটা দোতলা তিনতলা মিলিয়ে।

স্বরঞ্জন দত্তরায়েব ঘরের সামনে একজন বেয়ারা বসে আছে, সে যথারীতি জানালো যে সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন।

তার কথা অবিশ্বাস করা গেল না, কারণ ঠিক তক্ষুনি সেই ঘরের দরজা ঠেলে একজন লোক বেরুলো, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল যে ঘরের মধ্যে এক ঝাঁক মানুষ।

দু' জায়গায় ঘা খেয়ে মেজমামা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন।

তিনি আর চ্যাচামেচি করলেন না, বেয়ারার কাছ থেকে স্লিপ নিয়ে তাতে নিজের নাম লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

চ্যাঁচামেচির চেয়ে অনেক বেশি কাজ হলো। প্রায় ম্যাজিকের মতন। সঙ্গে সঙ্গে নীল স্যুট পরা একজন সুপুরুষ বেরিয়ে এসে প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, পিনাকপানি ? পিন্টু ! কী আশ্চর্য ব্যাপার ! এ যে মেঘ না চাইতেই জল। আজ সকাল থেকে তোর কথাই ভাবছি ! কেমন আছিস ?

তারপরেই আর্দালির দিকে ফিরে তিনি বললেন, সুখরাম, পাশের কামরাটা খুলে দাও ! এ সি চালাও।

মেজমামার হাত ধরে বললেন, আয় পিন্টু, আমরা এখানে বসি।

মেজমামা বললেন, তুই কাজে ব্যস্ত ছিলি, ঘরে অত লোক দেখলাম।

সুরঞ্জন দত্তরায় বললেন, থাক না, ওরা কাজ করুক। তুই এসেছিস এতদিন পর। তুই আমার এই অফিসের ঠিকানা জানলি কী করে ? এখানে এসেছি মাত্র দেড় বছর !

—তোর চিঠি পেলাম যে !

—পেয়েছিস ? উত্তর দিলি না কেন ?

—এই তো উত্তর দিতে সশরীরে এসেছি। চিঠি পেলাম মাত্র দু'দিন আগে।

পাশের ঘরটি ছোট, কিন্তু খুব সাজানো। অনেকগুলো কালো রঙের গদিমোড়া চেয়ার, টেবলের ওপর একটা ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। কোনো ফাইল বা একটুকরো কাগজও নেই সেখানে, অফিস বলে মনেই হয় না

সেখানে বসার পর সুরঞ্জন দত্তরায় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটিকে তো চিনতে পারলাম না।

মেজমামা বললেন, এ আমার ভাগ্নে। তুই আগে দেখিস নি।

সুরঞ্জন দত্তরায় বললেন, খুব ভালো ছেলে মনে হচ্ছে। এই বয়েসী কোনো ছেলে তার মামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ তো আজকাল দেখাই যায় না। আমার ছেলে আমার সঙ্গে দার্জিলিঙ-এ যেতেই রাজি হলো না। তোমার নাম কি ভাই ?

আমি আমার নাম জানালুম।

সুরঞ্জন দত্তরায় বললেন, পিন্টু, এই ছেলেটিকে দেখে আমার লোভ হচ্ছে। একে আমায় দিবি ?

মেজমামা অবাক হয়ে বললেন, তোকে দেবো মানে ? তুই ওকে তোর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাস নাকি ? অ্যাঁ ?

—ওকে আমার জামাই করতে পারলে খুশীই হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়,

আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। অসুবিধা আছে। ওকে আমার অফিসে একটা চাকরি দিতে চাই। আসলে ব্যাপার কী হয়েছে জানিস, পিণ্টু। আজই আমার এখানে একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আমি ঠিক করে রেখেছিলুম, প্রথম যে ছেলেটিকে দেখে আমার পছন্দ হবে, তাকেই কাজটা দেবো।

মেজমামা স্তম্ভিতভাবে প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর পাগলের মতন হাসতে লাগলেন হাত-পা ছুঁড়ে।

মেজমামার হাসি বন্ধ করার জন্য গম্ভীরভাবে বললুম, আমার তো চাকরির দরকার নেই। আমি অলরেডি এক জায়গায় কাজ করি।

সুরঞ্জন দত্তরায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাতে কী হয়েছে। সেটা ছেড়ে দাও। চাকরি পাল্টাও। চাকরি না পাল্টালে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। এক জায়গায় একঘেয়ে চাকরিতে কত কিছু দেখা বাকি থেকে যায়।

মেজমামা হাসতে হাসতেই বলে যেতে লাগলেন, বাজে কথা! বাজে কথা! ও কোথাও চাকরি করে না। একেবারে কাঠ বেকার! দে, দে, ওকে একটা চাকরি দে, কুণু। আমার প্রেস্টিজ বাঁচা!

—চাকরি তো হয়েই গেল। এক্ষুনি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার ইস্যু করে দিচ্ছি। এখন কী খাবি বল। চা-কফি-কোল্ড ড্রিংকস? বীয়ার?

—সত্যি কুণু, তুই ওকে চাকরি দিচ্ছিস? এ যে রূপকথা রে!

—দ্যাট ইজ সেট্‌লড! কাল থেকে জয়েন করবে। কত মাইনে চাই?

—তুই ওর ইণ্টারভিউ নিলি না, কোয়ালিফিকেশান জিজ্ঞেস করলি না। এমনি এমনি চাকরি হয়ে গেল?

—মুখ দেখেই সব বোঝা যায়। ওয়েল বিহেভ্‌ড ছেলে। স্বাস্থ্যও খারাপ না। আচ্ছা, আমি ওকে দু-একটা কথাও জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি।

সুরঞ্জন দত্তরায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বোলালেন। উল্টো-ভাবে আর একবার।

তারপর বেশ নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ইংরিজিতে কিছু কিছু চিঠি ড্রাফ্‌ট করতে পারবে? শক্ত কিছু নয়, পয়েণ্টসগুলো আমরা বলে দেবো!

আমি দারুণ জোরে মাথা নেড়ে বললুম, আজ্ঞে না। আমি ইংরিজিতে খুব কাঁচা, গ্রামার ঠিক থাকে না, প্রচুর বানান ভুল হয়।

—ঠিক আছে। তুমি অঙ্কে কী রকম? অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে সিম্‌পল কিছু হিসেবের কাজ। ওয়ার্কারদের মাইনের বিল বানানো।

—অসম্ভব ! তাহলে কেউ মাইনেই পাবে না। আমি অঙ্কে বরাবর গাড্ডু পেয়েছি। সাতচল্লিশের সঙ্গে তিপ্পান্ন যোগ করলে কত হয়, সেটাই আমি বলতে পারবো না।

মেজমামার চোখ দুটো রসগোল্লার মতন হয়ে গেছে। সুরঞ্জন দস্তুরায় মুচকি মুচকি হাসছেন। মেজমামা কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই তিনি হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে আবার আমাকে বললেন, আচ্ছা. ঠিক আছে। তুমি কিছু ঘোরাঘুরি করতে পারবে ? অফিসের কাজে। এই ধরো, দুর্গাপুর, পাটনা, জামশেদপুর এইসব জায়গায় অফিসের কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে. ভালো ট্রাভলিং অ্যালাউয়েন্স পাবে।

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললুম, দেখুন, আমি একলা কক্ষনো ট্রেনে চাপিনি। জীবনে বর্ধমানের চেযে বেশি দূব যাইনি। আমার ভয় করে। চারদিকে কত চোর-ডাকাত ঘুরে বেড়ায়। নিজের বাড়িতেই সবাই নিশ্চিন্ত। আর একটা কথা, আমি খুব কাগজপত্র হারিয়ে ফেলি, ব্যাগ হারাই, ছাতা হারাই। আমাকে এই কাজ দেবেন না, প্লিজ, আমি পারবো না !

—ঠিক আছে। তোমাকে ট্রেনে করে দূরে কোথাও যেতে হবে না। কলকাতায় ট্রামে-বাসে-ট্যাক্সিতে ঘোরার অভ্যেস নিশ্চয়ই আছে। এই কলকাতাতেই আমাদের তিনটে ব্র্যাঞ্চ, আরও পাঁচ-ছটা অফিসের সঙ্গে আমাদের রোজ কাজকারবার হয়। তোমাকে সেই সব অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। টেলিফোন তো পাওয়া যায় না সবসময়। তুমি অফিসে এসেই সই করে বেরিয়ে পড়বে, সারা দুপুর ঘোরা-ঘুরি করে আবার ফিরে আসবে বিকেলে।

—দুপুরবেলা ? ওরে সর্বনাশ ! আমার একদম রোদ্দুর সহ্য হয় না। একটু রোদ মাথায় লাগলেই সাইনোসাইটিশ ? আজ বৃষ্টির দিন বলে আমি বেরিয়েছি। অন্যদিন খুব ভোর আর সন্ধের পর ছাড়া আমি বাড়ি থেকেই বেরুতে পারি না। মাপ করবেন, আমায় দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করতে বলবেন না।

সুরঞ্জন দস্তুরায় এবার হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, বা-বা-বা-বা ! এই তো চাই, এই তো চাই ! ঠিক এইরকমই একজনকে চেয়েছিলুম ! তুই কাকে এনেছিস রে, পিন্টু ! এ যে রত্ন ! আমার অফিসের পক্ষে আইডিয়াল !

এবার আমার অবাক হবার পালা !

মেজমামার মুখে আবার হাসি ছড়িয়েছে।

সুরঞ্জন দস্তুরায় আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, শোনো, তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। আমার অফিসে দশ-বারোটা ইংলিশের এম এ গড়াগড়ি যাচ্ছে।

যে-কোনো চিঠি লিখতে বললেই তারা ঝটাঝট লিখে আনে। এমনকি আমার ইংরিজিতে পর্যন্ত ভুল ধরে। তারপর ধরো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে আছে কুড়ি-পঁচিশটা বি কম, এম কম। তারা সব সময় হিসেব করছে, কী করে বেশি ওভার-টাইম পাবে, কী করে ফল্‌স মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছুটির মাইনে পাওয়া যায়, কী ভাবে ইনক্রিমেণ্টের জন্য চাপ দিতে হয়, এইসব! কাজেই অ্যাকাউন্টেসের লোকও আমার দরকার নেই। অন্য স্টাফদের মধ্যে অনেকেরই ধান্দা, কী করে পাটনা-জামসেদপুরে অফিসের ট্যুর ফেলবে। ট্রাভলিং অ্যালাউন্সের লোভ। সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের ভাডা নেয়, শস্তায় হোটেলে থেকে টাকা বাঁচায়। আর একদল আছে, যারা অফিসে এসেই নামটি সই করে অন্য অফিসে কাজের নাম করে বেরিয়ে পড়ে। কাজ না থাকলেও যাবেই। ঐ সময়টা তারা সিনেমা দেখে, না পার্কে শুয়ে শুয়ে প্রেম করে, তা কে জানে। মোটকথা, তাদের অফিসের চেয়ারে বসিয়ে রাখাই একটা সমস্যা। দুপুর হলেই হাওয়া। সেই জন্যই আমি এমন একজন চাইছিলাম, যে সারাক্ষণ অফিসে নিজের জায়গায় বসে থাকবে। আমি যা দেখছি, বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে একমাত্র তোমারই এই যোগ্যতা আছে। আমাদের অফিস খোলে সাড়ে আটটায়। রোদ চড়া হবার আগেই তুমি চলে আসবে অফিসে। ফিরবে সূর্য অস্ত যাবার পর।

মেজমামা উঠে এসে আমার কাঁধে একটা বিরাট থাবড়া মেরে বললেন, এবার চাঁদু, পালাবে কোথায়? নিজের মুখেই স্বীকার করলি, তুই ঘোরাঘুরি পছন্দ করিস না।

তারপর সুরঞ্জন দত্তরায়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, তুই যে কামাল করে দিলি, রুণু! উল্টো প্যাঁচে ছেলেটা একেবারে কুপোকাৎ! ছোড়দির কাছে আমার দারুণ প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে। তুই এই ছেলেটাকে কী কাজ দিবি?

—কাজ খুব সহজ। আমাদের ডেসপ্যাচ সেকশানে সারাক্ষণ বসে থাকবে। বাইরের অনেক লোক কত জরুরি চিঠিপত্র নিয়ে আসে, অনেক সময় সীটে লোকই পায় না। এ চিঠিগুলো রিসিভ করবে, আমাদের এদিককার চিঠিগুলো শুধু এন্ট্রি করে দেবে খাতায়, পিওনরা নিয়ে যাবে। আসল কাজ হলো বসে থাকা। অফিসটাকে বাইরের লোকদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করা।

—বাঃ, এ তো ভালো কাজ। আমি ভেবেছিলুম, টুল-ফুলে বসতে হবে বোধহয়। এ তো দেখছি চেয়ার পাবে। কত মাইনে দিবি?

—দু হাজার দিলে চলবে?

—অ্যাঁ ? এত টাকা ? বলিস কি ? অ্যাত টাকা নিয়ে এ ছেলেটা কী করবে ?

—ঠিক আছে, আড়াই হাজার ?

—তুই পাগল নাকি ? আমি কমাতে বলছি। বেকার ছেলে, এতদিন বাজার থেকে চুরি করা টু-পাইস ছাড়া আর কোনো রোজগার ছিল না, হঠাৎ হাতে একসঙ্গে এতগুলো টাকা পেলে মাথা ঘুরে যাবে। না, না, অত দরকার নেই।

—তা হলে তিন হাজারই পাবে। আজকাল এর কমে কারুর চলে না। এখন কয়েক মাস তিন হাজারই চলুক, পরে আবার বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

—তুই আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিস না তো, রুণু ? এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না !

—ঠাট্টা ? উপকারটা তো আমার। একজন ঠিক ঠিক লোক পেলাম।

তার পরেই তিনি ফোন তুললেন, ত্রিপাঠী, একবার এ ঘরে আসুন তো ! একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার তৈরি করতে হবে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই চাই।

ফোন রেখে দিয়ে তিনি বললেন, কী আশ্চর্য যোগাযোগ। কাল মাসের পয়লা তারিখ। তুমি কাল থেকেই জয়েন করো। ওয়েলকাম টু আওয়ার অফিস। এবার একটু কফি খাওয়া যাক।

মেজমামা বললেন, তুই কবে সিঙ্গাপুর আসছিস, রুণু ?

—আমি পনেরো তারিখ মালয়েশিয়া যাচ্ছি। অফিসের কাজ। ওখান থেকে সিঙ্গাপুরে কয়েকদিন থেকে আসবো। আমার বউ যেতেও পারে সঙ্গে। সিঙ্গাপুরে কিছু শপিং-টপিং করবে। সেই জন্যই তোকে চিঠি লিখেছিলাম। ফরেন এক্সচেঞ্জ তো বেশি পাওয়া যাবে না। তোর বাড়িতে কয়েকটা দিন থাকা যাবে ?

—আমার ভাগ্নেকে চাকরি না দিলেও তুই থাকতে পারতি। যখন ইচ্ছে।

—তোর কোন অসুবিধে হবে না ?

—অসুবিধের কোনো প্রশ্নই নেই। গেস্টদের জন্য একখানা আলাদা ঘর রেখেছি। নতুন তোয়ালে, সাবান, টুথপেস্ট সব সাজানো আছে। বাড়িতে যা রান্না হয়, তাই খাবি।

—আমার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঝামেলাই নেই। ডাল-ভাত আর ডিম সেদ্ধ হলেই আমার চলে যায়।

—তুই রোজ ডিমসেদ্ধ খাস ?

—রোজ। দুটো করে।

—হার্ড বয়েলড ?

—না, হাফ বয়েলড। ভেতরের কুসুমটা নরম থাকা চাই।

—তাই বল। এই জন্য তুই এত উন্নতি করেছিস! যে-কোনো কাজের ব্যাপারে চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারিস। ভেরি গুড! ডিম খায় না বলেই বাঙালী অফিসার জাতটা অধঃপাতে গেল। নীলু, তুই এখন থেকে প্র্যাকটিস রেখে যা।

বেয়ারা এসে কফি দিয়ে গেল। তাতে চুমুক দিতে যাচ্ছি, সুরঞ্জন দত্তগুপ্ত বললেন, থামো, থামো, এক মিনিট! আজ এরকম একটা ভালো যোগাযোগ ঘটে গেল। চলো, সেলিব্রেট করা যাক। এখন প্রায় একটা বাজে, তোমরা চলো, তোমাদের কোনো ভালো জায়গায় লাঞ্চ খাওয়াবো। কফি খেয়ে খিদে নষ্ট করো না। কিরে, পিন্টু, কোনো আপত্তি নেই তো।

মেজমামা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, কোনো আপত্তি নেই। কোনো আপত্তি নেই।





আজ সকাল থেকেই আকাশ একেবাবে পরিষ্কার, ঝকঝকে বোদ উঠেছে। জল নেমে গেছে অনেক বাস্তা থেকে। প্রচুব লোক বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে। কলকাতায় আবাব স্বাভাবিক, অর্থাৎ অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেছে।

আজ সাবা বাড়ি আমাকে অফিস পাঠাবাব জন্য ব্যস্ত। মেজমামা গলা সাধা বন্ধ বেখে আমাকে অফিসের আদবকায়দা শেখাচ্ছেন। সহকর্মীদেব সঙ্গে কীভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হয়, সে সম্পর্কে তিনি এত কথা বলতে লাগলেন যে আমার মনে হলো, ডেল কার্নেগিব বইটা ওঁব মুখস্থ। বৌদি আমার জন্য আজ স্কুলেই গেল না। মুখখানা বেশ হাসি হাসি। আমাকে হাঁড়িকাঠে পাঠাবার জন্য ভেতরে ভেতরে তা হলে ওব খুবই ইচ্ছে ছিল। মা বলে ফেললেন, আর তো কিছু না, আত্মীয়-স্বজন সবাই বলতো, নীলুটা কিছু করে না, জীবনটা নষ্ট করছে, এই কথাগুলোই আমার বুকে বাজতো। এখন সবাব কাছে মাথা উঁচু করে বলতে পারবো, নীলু এক কথায় তিন হাজার টাকা মাইনের কাজ পেয়েছে। ওর যোগ্যতা আছে বলেই তো পেয়েছে!

আমি জীবনে কোনোদিন এত সকালে ভাত খেতে পারি না। কিন্তু মা খাওয়াবেনই। প্রথম দিন নাকি আমি ক্যান্টিন খুঁজে পাবো না। সিট ছেড়ে বাস্তায় গিয়ে খাবার খাওয়াও উচিত না। মেজমামাও বললেন, খেয়ে নে। মুখের গেরাশ ফেলে যেতে নেই। ভাত খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

বৌদি দাদার একটা পুরনো ঘড়ি পরিয়ে দিল আমার হাতে।

আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে উঠে পড়লুম একটা মিনি বাসে।

সুরঞ্জন দত্তরায় বলে দিয়েছিলেন, আমাকে প্রথম দিন জয়েনিং রিপোর্ট দিতে হবে অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রিয়নাথ মল্লিকের কাছে। দোতলায় একটা বড হল-ঘর আছে, তিনি সেখানে বসেন।

কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই সুইং ডোরের সামনে একজন আর্দালি

আমাকে আটকালো। বেশ বুড়ো মতন চেহারা হলেও চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। হাত তুলে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন ?

আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বাড়িয়ে দিলুম তার দিকে।

সে তিন লাইনের সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো দেড় মিনিট ধরে। তার পর বললো. হুঁ. আজই জয়েনিং ! এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন কেন ? ওবেলা এলেও পারতেন।

আমি ঘড়ি দেখে বললুম, আমাকে যে ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যেই আসতে বলা হয়েছে। এখন ঠিক সাড়ে আটটা।

সেই বৃদ্ধটি নিজের ঘড়ি দেখে বললো. এখনো দু মিনিট বাকি আছে। আপনার ঘড়ি ফাস্ট। তা হলে দু মিনিট অপেক্ষা করুন !

দু মিনিট আগেও ভেতরে ঢোকা যাবে না, এখানে এত কড়াকড়ি ? দাঁড়িয়ে রইলুম দেয়াল ঘেঁষে।

অন্যান্য পুরুষ ও মহিলারা গট গট করে আমার সামনে দিয়ে হলঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দরজা ঠেলে, আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। আর্দালিটি নিজের টুলে বসে একটা ব্লেড দিয়ে নখ কেটে চলেছে মন দিয়ে। দু মিনিটের জায়গায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল, তবু সে ভ্রূক্ষেপ করছে না।

এ তো মহা মুশকিলের ব্যাপার। প্রথম দিনেই অফিস লেট ? অথচ আমার কোনো দোষ নেই। আর্দালিটির বেশ ব্যক্তিত্ব আছে, তাকে আর ঘাঁটাতে সাহস হয় না।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার পর সে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, যাবেন ?

অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি কি এই বুড়োটার মুখ দেখবার জন্য ? কিন্তু মাথা গরম করলে চলবে না।

আর্দালিটি আমাকে নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলো।

খবরের কাগজে-টাগজে লেখে যে বেশির ভাগ অফিসেই নাকি কর্মচারিরা ঠিক সময় আসে না, এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা পরে তারা হেলতে-দুলতে ঢোকে। কিন্তু সেই বর্ণনার সঙ্গে তো এখানকার দৃশ্য মিলছে না। হলঘরটার মধ্যে প্রায় গোটা চল্লিশেক টেবিল, প্রায় প্রত্যেকটাতেই দু'জন-তিনজন করে লোক বসে আছে। অনেকেই এর মধ্যে মন দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে।

ঢুকেই ডান পাশের বড় টেবিলটা সুপারিনটেনডেন্ট, বা বড়বাবুর। তিনি

হাজিরার খাতাটার পাতা ওল্টাচ্ছেন নিবিষ্টভাবে।

প্রিয়নাথ মল্লিকের নামের সঙ্গে কিংবা তাঁর পদের সঙ্গে চেহারাটা একেবারেই মেলে না। সাফারি স্যুট পরা এক বিশাল বলশালী পুরুষ, জামা ভেদ করে ফুটে উঠেছে তার দু বাহুর মাস্‌ল আর চওড়া বুক। গত শতাব্দীতে জলদস্যুদের সর্দার হলে এঁকে মানাতো, এ যুগেও পর্বত অভিযাত্রী কিংবা বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন, তার বদলে নিছক একটা অফিসের বড়বাবু হয়েছেন। কেরানিদের বডবাবু হতে গেলে এত বড় চেহারার কী দরকার? হিন্দি সিনেমার ভিলেন হলেও রোজগার করতে পারতেন অনেক বেশি টাকা।

আর্দালিটি বললো, বড়বাবু, এই যে এসে গেছে!

বড়বাবু আমার নিয়োগপত্র বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না, চিঠিখানা একবার দেখেই সরিয়ে রাখলেন পাশে। তার পর আমার মুখের দিকে খানিকটা যেন বিরক্তির দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আজই জয়েন করতে চান, না কাল আসবেন?

আমি শুকনো গলায় বললুম, আমাকে তো আজই আসতে বলা হয়েছে।

তিনি একবার নিজের হাতঘড়ি, তার পর অফিসের দেয়ালঘড়ি, তার পর আমার হাতের দিকে চেয়ে রইলেন। আপনমনে বললেন, আজই জয়েন করতে চান? ঠিক আছে। আপনি একটু দাঁড়ান।

বড়বাবু উঠে গিয়ে অন্য তিন-চারজন লোককে ডাকলেন। তার পর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী সব যেন আলোচনা করতে লাগলেন কয়েক মিনিট ধরে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আমার দিকে।

আমি কি তারিখ ভুল করলাম? নাঃ, আজ তো পয়লা তারিখ ঠিকই। চিঠিতে সেই তারিখই লেখা আছে। অথচ আজ এসে পডে যেন কোনো অন্যায় করে ফেলেছি!

একটু পরে বড়বাবু ফিরে এসে বললেন, ঠিক আছে। জয়েন করুন। আসুন আমার সঙ্গে।

বাঁ দিকে একেবারে কোণের একটা টেবিলের কাছে এসে তিনি বললেন, বসুন এখানে। ঐ পুরনো গেলাশে জল খাবেন না, একটা নতুন গেলাশ দিচ্ছে। পিন, জেমস ক্লীপ যা দরকার হবে, চেয়ে নেবেন।

তারপর তিনি চলে যেতে যেতে হাঁক দিলেন, এই বৈকুণ্ঠ, এখানে একটা গেলাশ দিয়ে যাও!

টেবিলটা ছোট, একদিকে প্রচুর চিঠিপত্র, তার ওপরে তিন-চারখানা পেপার ওয়েট। আর কোনো জিনিস নেই।

আমি সন্তর্পণে চেয়ারটায় বসলুম।

দু'পাশের টেবিলে কয়েকজন খুব মন দিয়ে কাজ করছেন। একবার তাকালেনও না আমার দিকে। কাছাকাছি সব টেবিলের কর্মীরাই কাজে খুব মগ্ন। দু'জন মহিলাও রয়েছেন, কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করছেন না।

এ কোথায় এলুম রে বাবা!

আমার ধারণা ছিল, নতুন কেউ কাজে যোগ দিতে এলে সবাই তাকে ঘিরে ধরে। আলাপ পরিচয় করে, কাজ বুঝিয়ে দেয়। কেউ কেউ হয়তো বলতেও পারে, চাকরি পেয়েছেন, প্রথম দিন খাওয়ান আমাদের। সেই জন্য মেজমামা আমাকে একটা একশো টাকার নোটও গুঁজে দিয়েছেন পকেটে। কিন্তু কেউ কোনো কথাই বলছে না এখানে!

গোমড়ামুখো বড়বাবুটি আমাকে কোনো কাজের কথাও বুঝিয়ে দিলেন না। প্রথম দিন একটু সাহায্য না করলে কেউ কাজ শুরু করতে পারে? আমি কি বসে বসে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো?

টেবিলটার দু'পাশে চারখানা ড্রয়ার। একটা ড্রয়ার টেনে খুললুম। তার মধ্যে দুটো দেশলাই, একটা নস্যির কৌটো, কোনো ব্যাঙ্কের পাশবই, কিছু খুচরো পয়সা, এইসব রয়েছে। এই রে, অন্য কারুর জিনিস!

ঝট করে বন্ধ করে দিলুম ড্রয়ারটা। অন্যগুলো খুলতে সাহস হলো না।

এই টেবিলে, এই চেয়ারে অন্য একজন বসতো, সে হয়তো প্রমোশন পেয়ে কিংবা অন্য চাকরিতে চলে গেছে। নিজের ব্যক্তিগত জিনিসগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যায়নি কেন? যে-কোনো সময় লোকটা হয়তো আসবে, এলে বলবে, অ্যাই, আমার ড্রয়ারে হাত দিয়েছো কেন?

ডেল কার্নেগির এক নম্বর উপদেশই হচ্ছে, প্রথম দিন অফিসে গিয়ে সব সহকর্মীদের দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকাবে। কেউ যেন তোমাকে গোমড়া কিংবা চালিয়াৎ বলে মনে না করে। (আমি ডেল কার্নেগির বই পড়া দূরে থাক, কখনো সে বই চোখেও দেখিনি। মেজমামা উবাচ।)

কিন্তু যাদের দিকেই তাকাই, কেউ আমার চোখে চোখ ফেলে না পর্যন্ত, চট করে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এমন কি মহিলারাও! আমার চেহারা কি এতই কুৎসিত? কিংবা কোনো রেপ কেসের আসামীর সঙ্গে আমার মুখের মিল আছে?

একজন ছোকরামতন বেয়ারা আমার টেবিলে একটা জলভর্তি গেলাশ রেখে বললো, এই নিন ! আর কিছু লাগলে বলবেন ।

ছোকরাটির মুখের রেখায় ও চোখের ভঙ্গিতে যেন সূক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসির ইঙ্গিত । আমার কিছু লাগবে কি না তা না শুনেই সে পেছন ফিরলো ।

র‍্যাগিং ? ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তারি কলেজগুলোতে প্রথম বছরের ছাত্রদের ওপর যে-রকম র‍্যাগিং করা হয়, এই কমার্শিয়াল ফার্মগুলোতেও সেরকম প্রথা আছে নাকি ? তা ছাড়া এদের এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে !

একজন মধ্যবয়স্ক লোক অন্যান্য টেবিল কাটিয়ে আমারটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে, একগাদা বন্ধ খাম ও খোলা চিঠি হাতে নিয়ে, ভুরু কুঁচকে বললেন, এই নাও ভাই, এগুলো ফ্রান্স, কানাডা আর দুর্গাপুরে যাবে । আর বাকিগুলো যাবে আমাদের বম্বে অফিসে । দীনেন, চিঠিগুলো ফেলে রেখো না, আজই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো !

হঠাৎ তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে গিয়ে বললেন, আরে এ কে ? এ তো দীনেন নয় ?

আমি খুবই বিনীতভাবে বললুম, আজ্ঞে, আমি আজ থেকে জয়েন করেছি। নতুন ।

ভদ্রলোক কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন । ডান দিকে বাঁ দিকে তাকাতেই অন্য কয়েকটি টেবিল থেকে কয়েকজন হা-হা করে হেসে উঠলো । কেউ কেউ আরও বেশি মজা করবার জন্য চাপড় মারতে লাগলো টেবিলে ।

মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি টেবিলের ওপর থেকে সব কটা চিঠি খামচে তুলে নিয়ে দ্রুত ফিরে গেলেন । বাক্যব্যয় করলেন না আর একটিও !

অন্যদের হাসিতে যোগদান করার জন্য আমি মাথা ফেরাতেই আবার সবার মুখে কুলুপ, সবারই কাজের প্রতি খুব মনোযোগ !

একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ আওয়ারে ফাঁকা হয়ে গেল অফিস ।

আমি সকালে ভাত খেয়ে এসেছি, এখন খিদে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া আমার চাকরির শর্তই হচ্ছে সর্বক্ষণ চেয়ারে বসে থাকা । প্রথম এক বেলা আমি কোনো কাজই করিনি বলে আমার অস্বস্তি লাগছে । কিছু কাজ না করেও কি মাইনে নেওয়া উচিত ?

অবশ্য কাজে ফাঁকি সবাই দেয় । ফাঁকি না দিলে ওভার-টাইম হবে কী

করে ? কাজের ভান করেও অনেক সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আমাকে তো কোনো কাজই দেওয়া হচ্ছে না। বাইরে থেকে কয়েকজন পিওন চিঠিপত্র নিয়ে এসেছে, আমি দেখেছি, কিন্তু তাকে আমার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতেই দেওয়া হয়নি, অন্য কেউ না কেউ তাকে ডেকে তার সব চিঠিপত্র নিয়ে নিচ্ছে।

এ রকম র‍্যাগিং ক'দিন চলে ?

লাঞ্চের পর কিন্তু সকলে ফিরলো না। সুরঞ্জনবাবু বলেছিলেন, দুপুরবেলা রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অধিকাংশ কর্মচারির বাতিক। টেবিল-গুলো ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। সকালে যারা কাজে মনোযোগী ছিল, এখন তারা মেতে উঠলো গল্পে। এর মধ্যে একজন কেউ আমার নাম পযন্ত জিজ্ঞেস করলো না।

একেবারে চুপ করে কতক্ষণ বসে থাকা যায় ?

মানুষের দু চোখের মাঝখানে একটা নাক থাকে, কিন্তু এত কাছের জিনিসটাকেও মানুষ অধিকাংশ সময়েই দেখতে পায় না। এখন আমি শুধু নাকটাকেই দেখতে পাচ্ছি !

টেবিলের এক পাশে যে সব পুবনো চিঠিপত্র ছিল, সেগুলেই পডতে শুরু করে দিলাম। খুব যে একটা পাঠযোগ্য জিনিস তা বলা যায় না, সব চিঠিই প্রায় এক-রকম, মালপত্র সাপ্লাই, স্পেয়ার পার্টস, র মেটেরিয়ালস, টেণ্ডার, হ্যানো-ত্যানো। তবু যেমনভাবে আমি চিঠিগুলো পড়ে যেতে লাগলুম, তেমন তন্ময়ভাবে ইস্কুলে লেখাপড়া করলে আমি প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হতুম।

হঠাৎ আমাব ঠোঁটে একটা দুঃখ-দুঃখ স্বাদ এসে গেল। পেটের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে অভিমান। আমি তো কারুর কোনো ক্ষতি করিনি, তবু এই লোকগুলো আমাকে এমন অবহেলা করছে কেন ? মানুষ মানুষকে অকারণে কেন আঘাত দেয় ! সবাইকে দেখে ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত মনে হয়, ওরা কি বুঝতে পারছে না, একজন নতুন লোককে এভাবে অগ্রাহ্য কবলে তাব মনে কতখানি লাগে ?

এরকম র‍্যাগিং যদি দু-তিনদিনও চলে, তা হলে আমি এ চাকরি রাখতে পারবো না !

আমার ব্যবহারে কি কোনো ত্রুটি হয়েছে ? নতুন যে আসে, তারই কি ডেকে ডেকে সবার সঙ্গে আলাপ করা উচিত ? আমি নিজের থেকে কিছু বলিনি বলেই কেউ আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছে না ?

ঠিক আছে, একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক।

মেয়েরা যেমনভাবে লিপস্টিক মাখে, সেইরকম ভাবে আমি ঠোঁটে আঙুল ঘষে ঘষে দুঃখ মুছে ফেলে হাসি আঁকলুম।

আমার পাশের টেবিলটা ফাঁকা হয়ে গেছে। তার পরের টেবিলে বসে আছেন একজন মাঝারি বয়েসের, রোগা চেহারার মানুষ। মুখটা অন্য দিকে ফেরানো।

আমি বেশ জোরে বললুম, নমস্কার! আমি নতুন এসেছি. আমাকে একটু কাজ বুঝিয়ে দেবেন? যদি দয়া করে একটুখানি···

ভদ্রলোকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে অন্য একজনকে বললো, ব্যানার্জি, আমি এখন চললুম, আমাকে আজ একবার দমদম যেতে হবে!

আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি চলে গেলেন টেবিল ছেড়ে।

ব্যানার্জি নামে উক্ত ভদ্রলোকটি বললেন, কাজের আঠা! নতুন নতুন যারা আসে, তারা খুব কাজের ক্যারদানি দেখাতে চায়, বুঝলেন দাদা!

আমার মনে হলো, ওরা আমার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে।

দুপুরটা যারা বাইরে কাটাতে গিয়েছিল, তারা কেউ কেউ ফিরে এলো বিকেলের দিকে। এসেই টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে তারা আবার বেরিয়ে যেতে লাগলো। এ অফিস ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়।

দেয়ালঘড়িতে ঠিক সাড়ে চারটে বাজতে দেখে আমিও টেবিল ত্যাগ করলুম। কিছুই কাজ করিনি. তবু সারা শরীর অবসন্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে আমি কখনো হেরে যাইনি।

চাকরি এই জিনিস? আজই এই চাকরির মাথায় পদাঘাত করা উচিত আমার। কিন্তু বাড়িতে সিংহের মত ওঁৎ পেতে বসে আছেন সিঙ্গাপুরের মেজমামা। আমি বেকার থাকলে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মায়ের সম্মান নষ্ট হয়। বৌদি অন্য সময় আমার সবরকম খামখেয়ালিপনায় তোল্লা দিলেও মনে মনে তার ইচ্ছে, সংসারে আরও কিছু টাকা আসুক। দাদা ফিরে এসে যদি শোনে আমি তিন হাজার টাকার একটা চাকরি পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি, তা হলে নির্ঘাৎ বলবে, এখন থেকে মল্লিকবাড়ির লঙ্গরখানায় ভিখিরিদের সঙ্গে বসে খাবি।

বড়বাবুর টেবিলের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মনে হলো, আমি তো কোনো হাজিরা খাতায় সই করিনি? অফিসে কাজ করতে গেলে এরকম একটা নিয়ম থাকে না?

মল্লবীরের মতন চেহারার বড়বাবু একটা ফাইলে ঘ্যাস ঘ্যাস করে কী যেন

লিখে যাচ্ছেন। একবার মুখ তুলতেই আমি বললুম, আমাকে কোনো জায়গায় সই-টই করতে হবে না ?

তিনি ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো জয়েনিং রিপোর্ট দেননি ?

—জয়েনিং রিপোর্ট ?

—আজ থেকে যে জয়েন করলেন, সেটা চিঠি দিয়ে জানাতে হবে না ?

অদ্ভুত ব্যাপার ! আমি কি আগে সাত ঘাটের জল খেয়ে এসেছি যে এসব ব্যাপার জানবো ? প্রথমেই কি ওঁর বলে দেওয়া উচিত ছিল না ? আমি কি ওঁর শত্রু ? আমাকে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি, খাতাতেও সই করলুম না, অর্থাৎ আমি যে আজ এসেছি, তার কোনো প্রমাণই রইলো না।

জেদ চেপে গেল। খানিকটা কড়া গলায় বললুম, আপনি কিছু বলেননি। এখন লিখে দিচ্ছি !

—লিখুন !

—একটা সাদা কাগজ পেতে পারি ?

—খুঁজে নিন।

ওঁর টেবিলেই একটা সাদা কাগজের প্যাড রয়েছে। সেটা তুলে নিয়েই লিখে দিলুম তিন লাইনের চিঠি। তার পর জিজ্ঞেস করলুম, খাতা ?

তিনি একটা ড্রয়ার খুলে অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে বার করলেন একটা লম্বা খাতা। একটা পাতায় আমার নাম লিখলেন, তার পর ধমকের সুরে বললেন, নিন !

মানুষকে বেশি অপমান করতে নেই, তা এরা জানে না। কোণঠাসা বেড়াল এক সময় হিংস্র হয়ে কামড়ে দিতে আসে। আমারও বুক থেকে দুঃখ-অপমান মুছে গিয়ে জ্বলে উঠেছে রাগ। কাল এসে এই লোকটাকে বলবো, কাজ দিন আমাকে। ভেবেছেন কি ?

সুরঞ্জন দত্তরায় বলে দিয়েছিলেন, আমাকে না ডাকলে আমি যেন তাঁর ঘরে না যাই। প্রথম দিন যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করি। মালিকপক্ষের সঙ্গে বেশি ভাব দেখালে অন্য সহকর্মীরা হিংসে করে, পেছনে লাগে। ঠিক আছে, আমি সুরঞ্জনবাবুর কাছে নালিশ জানাবো না, কাল থেকে নিজের দাবি আদায় করে নেবো। চাকরি যখন পেয়েইছি, তখন অন্তত এক মাসের মাইনে না নিয়ে ছাড়ছি না।

অফিসের বাইরের বাতাসটাই অন্যরকম। চমৎকার মুক্তির স্বাদ। বেশ স্বাধীন মানুষের মতন একটা সিগারেট ধরালুম। দাঁতে দাঁত চেপে তিরিশটা দিন পার করতেই হবে। তার পর দেখা যাবে।

একটা ছোট গলি দিয়ে খানিকটা গিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়। সেখানে পৌঁছবার আগেই একটা ট্যাক্সি থামলো আমার গা ঘেঁষে। ঝট করে দরজা খুলে নেমে এলো দু'জন লোক। আমাকে দু দিক থেকে চেপে ধরে বললো, গাড়িতে উঠুন!

আমি কিছু বলার চেষ্টা করতেই একজন আমার মুখে হাত-চাপা দিয়ে বললো, গোলমাল করবেন না। উঠুন, উঠুন!

ওরা আমাকে ঠেলতে লাগলো ট্যাক্সির দরজার দিকে।

রাস্তাটা ছোট হলেও কিছু লোকজন চলাফেরা করছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একজন বাদামওয়ালা। কেউ এই দৃশ্যটি নিয়ে মাথা ঘামালো না।

ভয় পাবার বদলে আমার একটু মজাই লাগলো। আমাকে গুম করছে? এরা কারা? আমি কি একটা মূল্যবান জিনিস? আমি কোনো সুন্দরী মেয়েও নই, কোনো ধনী ব্যবসায়ীর আদরের ছোট ছেলেও নই। আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছে? দেখতে হচ্ছে, ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায়! সারা দিন এক চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকার পর এরকম একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা মন্দ কি!

ট্যাক্সির মধ্যে আর একটি লোক বসে আছে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। ট্যাক্সিটা বড় রাস্তায় পড়ে বেশ স্পিড নিতে সেই লোকটি আমার দিকে চেয়ে বললো ভয়ের কিছু নেই। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

লোকটিকে চিনতে অসুবিধে হলো না। আমার নবলব্ধ চাকরির একজন সহকর্মী। একজন একে ব্যানার্জিদা বলে ডেকেছিল। এই লোকটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল একটি বিদ্রূপ বাক্য।

আমি বললুম, আলাপ করার কায়দাটা একটু নতুন, তাই না?

লোকটি বললো, বললাম তো, ভয়ের কিছু নেই। আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। চ্যাঁচামেচি করে রাস্তার লোক ডাকার চেষ্টা করবেন না!

অন্য দু'জন বসেছে ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশে। কারুর হাতেই পিস্তল কিংবা ছুরি-টুরি কিছু নেই। খামোখা এদের ভয় পেতে যাবো কেন? আমি চ্যাঁচামেচি করলেও রাস্তার লোক নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাববে। এরকম একটা দামড়া লোককে কেউ ফটফটে দিনের আলোয় ধরে নিয়ে যায়?

সারাদিন ধরে আমার প্রতি যেরকম অপমানজনক ব্যবহার করেছে, তার শোধ নেবার এই তো প্রকৃষ্ট সময়।

আমি বললুম, এই অফিসে তো ভালোই মাইনে দেয় শুনেছি। আপনি বুঝি তার পরেও পার্ট টাইম গুণ্ডামি করেন?

ব্যানার্জি নামের সেই ভদ্রলোক বললেন, একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন!

সামনের সিট থেকে একজন বললো, সিগারেটটা আপনার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, আপনি ইচ্ছে করলে আর একটা ধরাতে পারেন। এই নিন।

আমি লোকটির প্যাকেট সুদ্ধ বাড়ানো হাতটি ঠেলে দিয়ে বললুম, থ্যাঙ্ক ইউ! আপনারা কোন্ দিকে যাচ্ছেন? আমি কিন্তু হাজরা মোড়ে নামবো!

সেই লোকটি বললো, আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।

—এটাও বুঝি র‍্যাগিং-এর অঙ্গ?

—র‍্যাগিং?

—সারা দিন কেউ আমার সঙ্গে একটাও কথা বললো না, হঠাৎ এখন জোর করে আলাপ করাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এর মানে কি? আমি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে ইণ্টারেস্টেড নই!

—আপনি হাজিরা খাতায় জোর করে সই করলেন কেন? তা না হলে আমাদের এই স্টেপ নিতে হতো না।

—জোর করে সই করলুম মানে? অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলেও খাতায় সই করার অধিকার জন্মায় না বুঝি?

—আমরা যেখানে যাচ্ছি, আগে সেখানে পৌঁছই, তারপর সব কথা হবে।

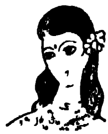
সব কটা জানলার কাঁচ তোলা। ট্যাক্সির ড্রাইভারটিও নিশ্চয়ই এদের চেনা, সে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

সামনের সিট থেকে আর একজন বললো, আপনি মশাই সর্বক্ষণ চেয়ারে সেঁটে বসে রইলেন, একবারও উঠলেন না, বাথরুমে পর্যন্ত গেলেন না?

অন্য দু'জন হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে উঠলো!

আমি বললুম, কেন, বাথরুমটাই বুঝি আপনাদের আলাপ করার জায়গা?

এবার ওরা সবাই মিলে, ট্যাক্সি ড্রাইভার সমেত একসঙ্গে হেসে উঠলো। এটা কী এমন হাসির কথা যে এদের হাসি থামতেই চায় না!



ট্যাক্সিটা ময়দান ছাড়িয়ে চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে একবালপুরের দিকে ঢুকে গেল। এই দিককার রাস্তাঘাট আমার ভাল চেনা নেই। কিছু কিছু বস্তি, আবার কিছু কিছু দারুণ হালফ্যাশনের বাড়ি।

অনেক গলিঘুঁজি ঘুরে একটা পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামানো হলো। ব্যানার্জি নিজে আগে নেমে গিয়ে বললো, আসুন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলুম ওপরে। একটা দরজায় ধাক্কা দেবার আগেই সেটা খুলে গেল, মনে হয় ট্যাক্সি থামবাব আওয়াজ পেয়ে কেউ জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখে ছিল। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা, বছর তিরিশেক বয়েস।

তার দৃষ্টি দেখেই মনে হলো, বাকি তিনজনকে সে চেনে, আমার দিকে অস্বস্তিকর ভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, ব্যানার্জিদা?

ব্যানার্জি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, এই যে, এ তোমার স্বামীর কাউণ্টার পার্ট। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য নিয়ে এলাম।

মহিলা বললো, এই, যাঃ কী করেছেন, ব্যানার্জিদা, না, না, ছি, ছি, ছি। এ রকম কেন করলেন?

ব্যানার্জি বললো, আরে আমাদের ভেতরে বসতে দাও! দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থাকবে?

অন্য দু'জনের একজন বললো, তোমরা বসো, আমি ট্যাক্সিটা ছেড়ে আসছি।

দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা ছোট ঘর, একটা সরু চৌকির ওপর সতরঞ্চি পাতা, আর কয়েকটা মোড়া রয়েছে ছড়ানো, চেয়ার টেব্লার কিছু নেই। একটা দেয়ালে একখানা শেতলপাটি সেঁটে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে, খুব সম্ভবত ওই দেয়ালের প্লাস্টার খসে গেছে, পাটি দিয়ে ঢাকা হয়েছে সেই জায়গাটা।

মহিলাটি আমার দিকে বার বার কুণ্ঠিতভাবে চাইতে চাইতে ব্যানার্জিকে

বললো, এটা মোটেই আপনার উচিত হয়নি। শুধু শুধু ওঁকে টেনে আনলেন কেন?

ব্যানার্জি চৌকির ওপর বসে পড়ে বললো, বসুন, ভাই বসুন। আগে আলাপ পরিচয়টা সেরে নিই। আমার নাম পল্লব ব্যানার্জি, আমি আছি পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে। স্টাফ ইউনিয়ানের আমি সেক্রেটারি।

পাশের লোকটাকে দেখিয়ে বললো, এ হচ্ছে পরিতোষ সান্যাল, অ্যাকাউন্টসে আছে, আর যে নীচে গেল, এক্ষুনি আসছে, সে হচ্ছে অরিন্দম দাস, সে ইউনিয়ানের একজন কমিটি মেম্বার আর এই মেয়েটি মণিকা দত্ত।

মেয়েটি লজ্জিত মুখে হাত জোড় করে নমস্কার করলো, আমিও তাকে প্রতি নমস্কার জানালুম।

পল্লব ব্যানার্জি বললো, মণিকা, তোমার পতি-দেবতাটি কোথায়?

মণিকা বললো, ঘুমোচ্ছে। সারাদিন ঘুমোয়। না ঘুমোলেও বিছানায় শুয়ে থাকে।

পল্লব ব্যানার্জি বললো, ভালো, ভালো, ঘুমোনো ভালো। এখন একবার ডাকো। এই ভদ্দরলোকের সঙ্গে আলাপ করুন।

মণিকা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। পল্লব ব্যানার্জি একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে অপলক ভাবে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করলো, আপনি বিয়ে করেছেন?

আমার বলতে ইচ্ছে হলো, আপনার ঘটকালির ব্যবসা আছে নাকি? কিন্তু মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লুম দু' দিকে।

—আপনার বাড়িতে কে কে আছে?

—আমাকে এরকম ভাবে জেরা করছেন কেন বলুন তো?

পল্লব ব্যানার্জি আপন মনে হাসলো।

মণিকা ফিরে এসে কুণ্ঠিত গলায় বললো, ও কিছুতেই উঠতে চাইছে না।

—জেগে আছে?

--হ্যাঁ, জেগে আছে, কিন্তু আসতে চাইছে না এ ঘরে।

—ঠিক আছে, তা হলে আমরাই যাচ্ছি ওই ঘরে?

পল্লব ব্যানার্জি উঠে দাঁড়িয়ে খুব নরম গলায় আমাকে বললো, একবার একটু চলুন পাশের ঘরে। আসুন, আসুন, লজ্জা করবার কিছু নেই।

পাশের ঘরটি অত্যন্ত অগোছালো। এখানে সেখানে জামা-কাপড় আর এঁটো কাপ ছড়ানো। বড় একটা খাটের ওপর কোঁচকানো চাদর আর ওয়াড়হীন কয়েকটা

বালিশের মধ্যে শুয়ে আছে একজন বেশ লম্বা মতন লোক, মুখে পাঁচ-সাত দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খালি গা, বেশ লোমশ বুক, শুধু পা-জামা পরা।

ঘরে ঢুকেই অবশ্য প্রথম দৃষ্টি পড়ে একটা দোলনার ওপর। অন্য সব কিছুর তুলনায় সেই দোলনাটি অনেক দামি, তাতে শুয়ে আছে দুটি ফুটফুটে শিশু। তাদের বয়েস বছর খানেক হবে, হুবহু একরকম দেখতে। এমনই সুন্দর যে মনে হয়, দুটি যমজ জাপানী পুতুল। আদর করতে ইচ্ছে করে।

বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটি বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বললো, পল্লবদা, কেন আপনি আমাদের লজ্জায় ফেলছেন বলুন তো? ভদ্দরলোককে কেন এখানে টেনে এনেছেন?

সে কথা গ্রাহ্য না করে পল্লব ব্যানার্জি আমাকে বললো, এই হচ্ছে দীনেন বোস।

আপনি আজ সারাদিন এর চেয়ারে বসেছিলেন। দীনেনকে চাকরি থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো!

সঙ্গে সঙ্গে মান পড়লো দুটো কথা। মেজমামার বন্ধু নির্মল পত্রনবীশ প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ফিসফিস করে বলেছিলেন, সব চাকরি শেষ! এ জেনারেশনের আর কেউ নতুন চাকরি পাবে না!

শিবরাম চক্রবর্তীর একটা গল্পে পড়েছিলাম, একটা চলন্ত দারুণ ভিড়ে ভর্তি বাসের সামনের দরজা দিয়ে একজন লোক জোর করে ঠেলেঠুলে উঠলো, আর অমনি পেছনের দরজা দিয়ে একজন টুপ করে খসে পড়ে গেল।

আমি এই দীনেন বোসকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি!

পল্লব ব্যানার্জি বললো, দীনেন ওর কাজে দু' একটা ভুল করেছিল। তিনখানা জরুরি চিঠি মিসপ্লেসড হয়েছে, এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভুল কি মানুষের হয় না? সকলেরই ভুল হতে পারে।

দীনেন বললো, আঃ ওসব কথা থাক না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

দোলনায় বাচ্চা দুটো কেঁদে উঠলো একসঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে মণিকা ছুটে এসে তাদের কোলে তুলে নিল। দু জনকেই। কোনো মায়ের বক্ষে একসঙ্গে দু দিকে দুটি সন্তান, এই দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি।

বাচ্চা দুটো তাদের মায়ের রূপ পেয়েছে।

ওদের বাবার চেহারাও খারাপ নয়, তবে গায়ের রং আমারই মতন কালো।

অরিন্দম নামে যে লোকটি ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে গিয়েছিল, সে ফিরে এলো এক ঠোঙা সিঙ্গাড়া নিয়ে, সঙ্গে একটি বাচ্চা ছেলে, তার হাতে কেট্‌লি ভর্তি চা আর কয়েকটা মাটির ভাঁড়।

মণিকা বললো, এ কী, আমি বুঝি চা করে দিতে পারতুম না ?

অরিন্দম বললো, কেন শুধু শুধু ঝঞ্ঝাট করবি ! এই তো পাশেই দোকান। আমরা সবাই এখানেই বসে আলোচনাটা সেরে নিই।

দীনেন বিরক্ত ভাবে বললো, আলোচনার কী আছে ? আমার যা বলার, তা তো বলেই দিয়েছি।

অরিন্দম বললো, না, তোমার কথা শোনা হবে না। সবাই মিলে কথা বলে একটা ডিসিশান নিতে হবে। কী বলুন, ব্যানার্জিদা।

পল্লব ব্যানার্জি বললো, নিশ্চয়ই, সেইজন্যই তো এসেছি !

ভাঁড়ে চা ঢেলে প্রথমটাই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে অরিন্দম বললো, নিন। সিঙ্গাড়া তুলে নিন, গরম আছে। আপনাকে জোর করে ধরে এনেছি, সে জন্য কিছু মাইণ্ড করেননি তো ? ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস !

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না।

খাটের পাশেই বসে পড়লো অন্তরা। আমার জন্য একটা মোড়া এনে দিল ব্যানার্জি। অচেনা কারুর বিছানায় বাইরের লোক এসে বসে না। পরিতোষ নামের লোকটি একটি কথাও বলছে না। দীনেন বিছানাতে আধ শোওয়া হয়েই রইলো। তার মুখখানিতে বিরক্তি মাখানো।

অরিন্দম বললো, মিঃ নীললোহিত, এই মণিকা আমার মাসতুতো বোন। একেবারে আপন নয়, তবে ছোটবেলা থেকেই খুব ক্লোজ। দীনেন ওকে বিয়ে করেছে দু বছর আগে। বিয়েটা আমার মাসি আর মেসো কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। ওঁরা বড্ড জেদী। সে যাই হোক, ওরা এখানে আলাদা সংসার পেতেছে, কী সুন্দর যমজ বাচ্চা হয়েছে, দেখছেন তো ! মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ এই কাণ্ড। দু মাস ধরে দীনেনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

পল্লব ব্যানার্জি বললো, আমরা এই নিয়ে আন্দোলন করবো ঠিক করেছিলাম। পেন ডাউন স্ট্রাইকের কথা ঘোষণাও করা হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই দীনেনকে নিয়ে। ও কিছুতেই আন্দোলন করতে রাজি নয়। ওর ধারণা, ও দোষ করেছে, তাই শাস্তি পেয়েছে। আবার সে জন্য ক্ষমাও চাইবে না। দেখুন তো, কী পাগলামি !

আমার এক হাতে সিঙ্গাড়া, আর এক হাতে চায়ের ভাঁড়, কোনোটাই মুখে দিতে পারছি না। সকলের চোখ আমার দিকে, আমি যেন আসামী!

অরিন্দম বললো, এর মধ্যে দীনেন আর একটা কাণ্ড করেছিল। একদিন বউ-বাচ্চাদের ফেলে উধাও হয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সন্ন্যাসী হয়ে যাবার তালে ছিল। এই পরিতোষ থাকে চন্দননগরে, ও ভাগ্যিস দীনেনকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে।

এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে পরিতোষ বললো, সেদিন দীনেন একেবারে উল্টোপাল্টা কথা বলছিল। ঠিক পাগলের মতন।

দীনেন বলে উঠলো, তোমরা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেন এত মাথা গলাচ্ছো?

অরিন্দম ধমক দিয়ে বললো, চোপ! ব্যক্তিগত ব্যাপার মানে, মণিকা আর বাচ্চাদুটোকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে!

দীনেন বললো, আমি সরে গেলেই মণিকাকে ওর বাবা-মা ফেরৎ নিয়ে নেবে। রাগ তো শুধু আমার ওপর!

অরিন্দম বললো, কাওয়ার্ডের মতন কথা বলো না। তুমি প্রেম করে বিয়ে করেছো, এখন তুমি বউয়ের দায়িত্ব নেবে না?

মণিকা বললো, আমি মরে গেলেও বাপের বাড়িতে কোনোদিন ফিরে যাবো না। আমি একটা স্কুলের চাকরির চেষ্টা করছি!

পল্লব বললো, ইউনিয়ান থেকে কম্পানিকে আমরা বলে দিয়েছি, দীনেনকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে ফেরৎ নিতে হবে। ওর জায়গায় কোনো নতুন লোককে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিলে আমরা বরদাস্ত করবো না। তবু আমাদের কিছু না জানিয়ে আপনাকে চাকরি দিয়ে দিল? ঐ সুরঞ্জন দত্তরায় শালা একটা ঝানু বদমাস। কম্পানির যত বে-আইনী কাজে ও মদত দেয়।

অরিন্দম বললো, ওটা কতবড় হারামজাদা, আজ আপনাকে জয়েন করতে বলে নিজে ডুব মেরেছে, অফিসেই আসেনি। আমরা যে ওকে প্রটেস্ট জানাতে যাবো, তারও উপায় নেই। আপনি চিঠি দেখিয়ে জয়েন করতে চাইলে বড়বাবু টেকনিক্যালি আপত্তি করতে পারেন না।

পল্লব বললো, আপনি খাতায় সই করলেন, তাতে আপনার রাইট এসটাব্লিসড হয়ে গেল!

অরিন্দম বললো, এরপর আপনাকে সরাতে চাইলে আপনি মামলা করতে

পারেন।

দীনেন আবার তেড়ে উঠে বললো, এ ভদ্রলোকের কী দোষ? ইনি চাকরি পেলে নেবেন না কেন? এই বাজারে চাকরি পেলে কেউ ছাড়ে?

আমার মাথার মধ্যে চিড়িক চিড়িক ব্যথাটা হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। ইচ্ছে করছে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে।

মণিকা বাচ্চা দুটিকে আবার নামিয়ে দিয়েছে দোলনায়। আমার চোখে চোখ রেখে বললো, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমরা কিন্তু আপনাকে এভাবে নিয়ে আসতে বলিনি এখানে!

অরিন্দম দীনেনকে বললো, একটা বদনাম নিয়ে চাকরি হারালে তুমি জীবনে আর কখনো চাকরি পাবে?

দীনেন বললো, আমি এ ভাবে আর জীবন কাটাতে পারছি না। আমি কাওয়ার্ড! আমি অপদার্থ! আমি মণিকাকে মুক্তি দিয়ে চলে যাবো!

মণিকাকে বেশ ব্যক্তিত্বময়ী মনে হয়েছিল। এবার সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালো। স্বামীর মুখ থেকে এ ধরনেব কথা শুনলে যে-কোনো মেয়ে অপমানিত বোধ করবেই।

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে থেকে মণিকাকে সামলে নেবার সুযোগ দিল।

তারপর পল্লব বললো, আপনি সব জেনেশুনেও এ চাকরি করতে পারবেন? দীনেন একটু আলাভোলা ধরনের হলেও সরল, ভালো মানুষ। অফিসের সবাই ওকে পছন্দ করে। আপনার ওখানে কাজ করতে খুবই অসুবিধে হবে। আপনি এখনো বিয়ে করেননি। আপনার দায়িত্ব কম, কিন্তু দীনেন বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

অরিন্দম বললো, আপনি যদি চাকরিটা আঁকড়ে থাকতে চান, আর দীনেন আবার বাড়ি ছেড়ে পালায়, তা হলে মণিকা, তার দুটি বাচ্চা, এই ফ্ল্যাটের ভাড়া, এই সব কিছুর দায়িত্ব মরালি আপনারই নেওয়া উচিত।

মণিকা মুখ ফিরিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বললো, ছিঃ! কী সব বলছো তুমি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

অরিন্দম বললো, আমি বলছি, মরাল দায়িত্ব।

ব্যথায় আমার মাথাটা ভারি হয়ে গেছে, নুয়ে পড়তে চাইছে। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, আপনাদের ঐ অফিসে আমি জীবনে আর কোনোদিন পা দেবো না। এবার আমি যেতে পারি?

অরিন্দম সোল্লাসে বলে উঠলো, জানতুম। ভদ্রলোকের মুখ দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল···

পল্লব বললো, এই প্রবলেমটা যে বুঝবে না, সে তো অতি হার্টলেস। উনি নিজের চোখে দেখলেন বলেই ঠিক বুঝলেন। প্ল্যানটা কী রকম করেছিলুম বলো।

দীনেন কিছু বলার চেষ্টা করলেও তাকে থামিয়ে দিল ওরা দুজন।

মাঝখানের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। তাকে পাশ কাটিয়ে বেরুতে গিয়েও সামান্য ছোঁয়া লেগে গেল তার বাহুর সঙ্গে। তার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না।

অরিন্দম বললো, দাঁড়ান না, আপনাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। আমি সিঙ্গাড়াটা খেয়ে নিই।

সে কথায় কান না দিয়ে আমি দৌড় লাগালুম সিঁড়ি দিয়ে। মাথার মধ্যে অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এবার কোনো ডাক্তারকে দেখাতেই হবে।

আমি যেন অন্ধের মতন হাঁটছি। এগলি ও গলি দিয়ে ঘোরাঘুরি করেও বড় রাস্তা খুঁজে পেলুম না। সন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তার আলো জ্বলেনি। এক সময় এসে পড়লুম একটা ফাঁকা জায়গায়, এক পাশে একটা এবড়ো খেবড়ো ধরনের বেশ বড় পুকুর, সেই পুকুরের ঘাটে একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে। কলকাতারই মধ্যে নৌকো সমেত পুকুর!

এদিকটায় মানুষজনও আর দেখতে পাচ্ছি না যে জিজ্ঞেস করবো, বড় রাস্তা কোন্ দিকে। এরপর বোধ হয় ক্রমশ গ্রাম এসে যাবে। উলটো দিকে ফিরে যাওয়াই ভালো।

পেছন ফিরতেই দেখি, একটু দূরে একটি নারী মূর্তি।

প্রথমে মনে হলো, মণিকা। সে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে এসেছে। কিংবা সে আমাকে নিভৃতে আরও কিছু জানাতে চায়।

আর এক পা এগোতেই বোঝা গেল. মণিকা নয়। অন্য কেউ। তা হলেও তার সমস্ত শরীরময় উপস্থিতিটা খানিকটা বেশ চেনা লাগছে।

তারপর আমি কেঁপে উঠলুম রীতিমতন। ভয়ে, না বিস্ময়ে? একটি যুবতীকে দেখে ভয় পেতে যাবো কেন?

মায়া কিংবা কল্পনা কিংবা চোখের ভুল, তা আজ পরখ করে দেখতেই হবে। এই মেয়েটিকেই আমি দেখেছি, রাত্তিরে বৃষ্টির মধ্যে আমাদের বাড়ির ছাদের

আলসের কাছে। রথীন তালুকদারের পার্টি অফিসের বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে এই মেয়েটিই দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সে একবালপুর কিংবা খিদিরপুরের কোনো জায়গায় এক জলার ধারে এসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিদ্যুৎ চমকে দেখেছি এই মুখ, দুপুরের রোদ পড়েছিল এই মুখে, এখন সন্ধের আলো-আঁধারিতে সেই একই মুখ।

আর একটু কাছে যেতেই মেয়েটি সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, রাস্তা চিনতে পারছো না?

আমার শরীরে আবার একটা শিহরন হলো।

এত পরিষ্কার, ঝংকারময় তার কণ্ঠ, কিছুতেই কোনো অবাস্তব নারীর হতে পারে না। একটি সত্যিকারের মেয়ে, সে এই নির্জন জায়গায় একা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

আমি অভিভূতের মতন বললুম, না। রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি বললো, এসো আমার সঙ্গে।

আমি বললুম, আপনি···আপনি আমাকে চেনেন?

সে বললো, ওমা, চিনবো না কেন? তুমি নীললোহিত! কেন, তুমি বুঝি আমাকে চিনতে পারছো না?

মিথ্যে কথা বলার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি দু দিকে মাথা নেড়ে বললুম, না।

সে কুলকুল করে হেসে বললো, আশ্চর্য! আশ্চর্য! মানুষের এমন ভুল হয় বুঝি?

আমি একেবারে কাছাকাছি এসে নির্লজ্জের মতন তাকে দেখলাম ভালো করে। আজও সে নীল শাড়ি পরেছে, লাল ব্লাউজ, লাল চটি, কানে দুটি লাল পাথরের দুল। উচ্চতায় আমার চেয়ে সামান্য একটু কম, মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা।

আমি খানিকটা দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলুম, তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখবো।

সে অসংকোচে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল তার একটা হাত।

তার ওপর আমার হাত রাখলুম। রক্ত-মাংসের নারীর উষ্ণ স্পর্শ! এবং সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, সত্যিই তো, একে আমি চিনি। আর প্রশ্ন করার কোনো মানেই হয় না।

দুটি সাইকেল আসছে এদিকে। পুকুরটার জলে একটা বড় মাছ ঘাই মারলো।

একটু দূরের একটা বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে কেউ সশব্দে এক ঝুড়ি ময়লা ফেললো নীচে।

এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হাত ছেড়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম পাশাপাশি। আমি তার শরীরের একটা সুগন্ধ পাচ্ছি। আমার মাথার ব্যথাটা মিলিয়ে গেছে।

একটুখানি যাবার পর সে বললো, তোমার খুব মন খারাপ, তাই না, নীললোহিত ?

—তুমি কি করে জানলে ?

—তুমি যখন আমায় ছুঁলে, তখনই টের পেলাম। তোমার আঙুলের ডগায় দুঃখ লেগে আছে।

—আঙুলের ডগায় তো রাগ থাকে, দুঃখও বোঝা যায় বুঝি ?

—আমি রাগটা ঠিক চিনি না।

—রাগ চেনো না ? ভালোই তো। তা হলে আর চিনতে হবে না। তুমি যে এমন নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলে, তোমার ভয় করছিল ?

—না, ওতে কোনো ভয় নেই। তবে আমার সব সময় একটা অন্যরকম ভয় করে।

সাইকেল আরোহী দুজন ফিরে আসছে। গতি মন্থর করছে আমাদের কাছে এসে। এসব পাড়া ভালো নয়। নানা রকম হাঙ্গামা হয় প্রায়ই, কাগজে পড়ি। কোনো যুবতীব সঙ্গে এখানে বেড়ায় না কেউ।

সে বললো, আমি এবার যাই! তুমি আর একটু গেলেই বড় রাস্তা পেয়ে যাবে।

—না, যেও না। ওরা কি করবে ? আমরা তাকাবো না ওদের দিকে।

—না, নীললোহিত, আমি যাই!

একজন গুণ্ডা সাইকেলটা ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপরে। অন্য লোকটা বললো, মেয়েটা কোথায় গেল ? একটা মেয়ে ছিল সঙ্গে!

আমার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললো, এই, তোর সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল সে কোথায় গেল ?

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলুম। সে নেই। এই লোকদুজনও তাকে দেখেছে।

অন্য একজন একটা ছুরি বার করে বললো, চ্যাচালে খোপড়ি উড়িয়ে দেবো!

আমি পকেট থেকে একশো টাকার নোটটা বার করে এগিয়ে দিলুম ওদের দিকে। অন্য গালে আর একটা চড় কষিয়ে একজন বললো, ঘড়িটা খোল, শালা !

আমার কাছে কোনোদিন মানি ব্যাগ থাকে না। আর আছে বুক পকেটে মাত্র তিনটি টাকা। ওরা ঘড়ি আর একশো টাকার নোটটা নিয়ে অকারণে আমার মুখে কয়েকটা ঘুঁষি মেরে হাতের সুখ করে নিল, তারপর এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে।

আমি একটা কথাও উচ্চারণ করিনি। সবাই জানে, গুণ্ডাদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলেই পেটে ছুরি খেতে হয়। ওরা কথা সহ্য করতে পারে না। দুজন সশস্ত্র দুর্বৃত্তের সঙ্গে একা খালি হাতে লড়ে যেতে পারে শুধু গল্পের বইয়ের নায়করা। আমি ছুরি-টুরি খাওয়া একদম পছন্দ করি না।

খুব বেশি মারেনি, নাক দিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছে শুধু। এ তো কিছুই না। ভুরিভোজের বদলে সামান্য জল খাবারের মতন।

বেশি আহত হবার ভঙ্গিতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রইলুম খানিকক্ষণ !

তারপর শুনতে পেলুম, সে বলছে, নীললোহিত, ওঠো।

আমি উঠে বসতেই সে আমার হাত ধরে টেনে তুললো।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কোথায় লুকোলে ?

সে বললো, ঐ যে, ঐ অন্ধকারের মধ্যে। এরা এত খারাপ লোক কেন ? তুমি টাকা আর ঘড়ি দিয়ে দিলে, তবু ওরা তোমাকে মারলো !

আমি বললুম, এর চেয়ে অনেক সামান্য কারণে খুন হয়। প্রকৃতি এখন জন-সংখ্যা কমাবার দায়িত্ব দিয়েছে কিছু কিছু মানুষেরই ওপরে।

—তোমার কোনো কিছু ভাঙেনি তো ?

—নাঃ ! নীলা, তুমি আবার এলে, তোমাকে দেখলে···

—নীলা ! আবার নাম বুঝি নীলা ?

—তোমাকে প্রত্যেকবারই নীল শাড়ি পরা দেখছি, তাই এই নামটা মনে এলো ! তোমাকে দেখতে পেলে ওরা আবার ফিরে আসতে পারে। আর কোনোদিন এরকম নির্জন জায়গায় এসো না।

—চলো, আমরা দৌড়ে বড় রাস্তার দিকে চলে যাই। তুমি দৌড়োতে পারবে, নীললোহিত !

—হ্যাঁ পারবো !

—তাহলে তুমি আমার হাত ধরে থাকো। শক্ত করে ধরো।

কিন্তু এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি ওর হাতটা খুঁজে পেলুম না। ওকে দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে।

আবার সাইকেলের বেলের শব্দ। আমি প্রাণপণে ছুট দিলুম সামনের দিকে। নীলা একটু দূরত্ব রেখে আমার পাশে পাশে ছুটছে। অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওকে, ক্রমশ ও মিশে যাচ্ছে অন্ধকারে।





মেজমামা বললেন, এ পাড়ায় কি একটাও ভালো ফোন আছে? কোনো জায়গা থেকে ফোন করা যাবে?

আমি বললুম, মোড়ের মাথায় একটা ওষুধের দোকান আছে। ওদের ফোনটা ব্যবহাব করতে দেয়।

মা বললেন, থাক, আব ফোন টোন করতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। অমন চাকরির কোনো দরকার নেই। ইস, ছেলেটাকে এমন ভাবে মেরেছে। ঠোঁটের পাশটায় কেটে গেছে কতটা। ছি ছি ছি ছি।

আমি বললুম, মা, চাকরিব ব্যাপাবটা আলাদা, আব মাব খাওয়ার ব্যাপাবটা আলাদা। এটা তো সাধাবণ গুণ্ডাদের ব্যাপার। ঐ সুবঞ্জনবাবু আরও বেশি বড গুণ্ডা!

মা বললেন, তবু ঐ অলক্ষুণে চাকবির জন্যই তো তোকে ঐ বাজে পাডাতে যেতে হয়েছিল!

মেজমামা বললেন, না, ছোড়দি, সুবঞ্জনকে আমি ছাডবো না। আমাব বন্ধু হয়ে সে এরকম নিমকহারামেব মতন কাজ করলো? এব চেয়ে তো নির্মল আর রথীন অনেক ভালো, তারা সরাসরি পারবে না বলে দিয়েছে। আর ঐ সুরঞ্জনকে আমরা কিছু বলিনি। সে এমনি একখানা তিন হাজার টাকার থালায় করে একটা চাকরি সাজিয়ে দিল আমার ভাগ্নের জন্য। হারামজাদার পেটে পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি ছিল?

মা বললেন, থাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর ওসব লোককে ঘাঁটাবার দরকার নেই! ওসব লোকেব পুলিশ-টুলিশ হাত করা থাকে।

মেজমামা বললেন, কী, আমি ওকে ভয় পাবো? আমি পিনাকপানি ব্যানার্জি ভয় পাবো ঐ একটা ছুঁচোকে? টেলিফোন কবারও দরকার নেই, চল তো নীলু, ওর বাড়ি গিয়েই বলে আসি। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই!

মায়ের আব কোনো আপত্তিতে কর্ণপাত না করে মেজমামা আমার হাত ধরে

টেনে নামাতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

আমারও ইচ্ছে করছে সুরঞ্জন দত্তরায়ের ওপর কিছুটা গায়ের ঝাল ঝেড়ে আসতে। আমি একা কিছু করতে পারবো না, মেজমামা থাকতে থাকতেই প্রতিশোধ যা নেবার নিতে হবে।

ঝট করে একটা ট্যাক্সিও পাওয়া গেল। তাতে উঠে বসে মেজমামা বললেন, ও ব্যাটা থাকে যোধপুর পার্কে। ওদিকটার রাস্তা আমি ভালো চিনি না। তুই চিনতে পারবি তো নীলু!

—একটু সময় লাগলেও খুঁজে বার করা যাবে!

—শোন, আমার মাথায় রক্ত ফুটছে টগবগ করে। রাগ না চণ্ডাল। যদি দেখিস আমি সুরঞ্জনের গলা টিপে ধরেছি, তা হলে আমার কানের কাছে দু'বার বলবি, প্রিমিয়াম! প্রিমিয়াম!

—তার মানে?

—তোব মানে বোঝার দরকাব নেই। শুধু দু'বার বলবি ঐ কথাটা!

—মানে না বুঝলে হয়তো কথাটা আমার মনে থাকবে না। আমি হয়তো ওর বদলে বলে ফেলবো, স্কচ! স্কচ!

—ওঃ হো, ঠিক আছে, তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা বড গোছের ইনসিউরেন্স করিয়েছি, আব দুটো অ্যানুয়াল প্রিমিয়াম বাকি আছে। সুরঞ্জনটার গলা টিপে ধরে যদি শেষ পর্যন্ত ওকে মেরেই ফেলি, তাহলে আর আমি ফাঁসির আসামী হিসেবে ঐ টাকাটা পাবো না। ফাঁসির আসামীর বউও ইনসিওরেন্সের টাকা পায় না। সুতরাং ঐ দুটো দেবার আগে আমার ফাঁসি যাওয়াটা ঠিক হবে না!

—সুরঞ্জনকে একেবাবে মেরে ফেলার দরকার নেই, মেজমামা। ওর একটা চোখ শুধু কানা করে দিলে হয় না? লোকে এর পরে ওর নাম দেবে কানা শয়তান!

—ঠিক আছে, আমি গলা টিপে ধরবো, তুই একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে ওর চোখে চেপে দিবি। পারবি না?

ট্যাক্সিচালকটি বাঙালী, সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো।

মেজমামা আস্তে কথা বলতে পারেন না, তিনি ওর তাকানোটার তোয়াক্কাও করলেন না। আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, নীলু, তুই ঠিক জানিস, যারা তোকে মেরেছে আর ঘড়ি-ফড়ি কেড়ে নিয়েছে, তারা ঐ ইউনিয়ানের

লোক নয়!

—না, না, ওরা কেন হতে যাবে? শেষে আমি দুটো সাধারণ ছিনতাইবাজের হাতে পড়েছিলুম!

—ঐ যে কী নাম, দীনেন বোস না কী বললি, তার বাড়ি থেকে বেরুবার পর ইউনিয়ানের লোকেরা তোকে ফলো করতে পাবে। তোকে ভালোমতন শিক্ষা দেবার জন্য তারাও পেঁদিয়ে দিতে পারে।

—তারা মারবে কেন? আমি তো বলেই এসেছি, আর জীবনে কখনো ঐ অফিসে পা দেবো না!

—বিশ্বাস করেছে কি? আজকালকার বাজারে একটা চাকরি পেয়েও কি কেউ এককথায় ছেড়ে দেয়? র‍্যাট রেস! র‍্যাট রেস!

—ওরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছে। ওরা আমার সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করেছে।

—জোর করে রাস্তা থেকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাওয়া মানে ভালো ব্যবহার?

—ওরকম নাটক অবশ্য না করলেও চলতো। আগে আমাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে আ ম নিজেই ওদের সঙ্গে যেতুম।

—ঐ দীনেন বলে লোকটার বউয়ের দুটো বাচ্চা?

—হ্যাঁ মেজমামা, কী সুন্দর যমজ। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

—ঐ সুন্দর দুটো বাচ্চাকে ফেলে ও হারামজাদা সাধু হয়ে যেতে চেয়েছিল? যারা বউ-বাচ্চা ফেলে সাধু হবার জন্য পালায়, তাদের শাস্তি দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই? আমার তো ইচ্ছে করছে, ঐ দীনেন হারামজাদার বাড়িতেও একবার যাই। বাচ্চা দুটোকে আদর করে আসি। আর বাবাটার মাথায় গোটা কতক রাম গাট্টা মারি।

—লোকটা খারাপ না। একটু অভিমানী ধরনের। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোককেই কাওয়ার্ড বললে প্রতিবাদ করে। ও কিন্তু বললো, হ্যাঁ, আমি কাওয়ার্ড!

—আসল কাওয়ার্ড হচ্ছে ঐ সুরঞ্জন। তোকে কাল ঐ অফিসের খাঁচার মধ্যে ভরে দিয়ে নিজে পালিয়েছিল!

যোধপুর পার্কের ভেতরের রাস্তাগুলো এক রকমের। ঠিকানা খুঁজে বার করা বেশ মুশকিল। বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোনা গেল।

একটা বেশ সুন্দর দোতলা বাড়ি। সামনে লোহার গেট, তারপর ছোট বাগান, মূল দরজার দু'পাশে দুটি অজন্তার স্টাইলে নারী মূর্তি আঁকা।

বেল বাজাবার পর একজন উর্দিপরা আর্দালি দরজা খুলে দিল।

মেজমামা হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সুরঞ্জন বাড়ি আছে?

আর্দালিটি বললো, সাহেব এইমাত্র উপরে গেলেন বিশ্রাম করতে! এই সময় তো কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

মেজমামা বললেন, ওকে বলো গিয়ে, ওর যম এসেছে! যমের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট লাগে না!

আর্দালিটিকে ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়লেন মেজমামা।

আর্দালিটি অভিজ্ঞ লোক, সে জানে কোন্ ধরনের মানুষদের ফেরানো যায় না। সে এবার বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কী বলবো, সাহেব?

—বলো, সিঙ্গাপুরের পিন্টু সাহেব এসেছে। তোমার সাহেবের বন্দুক আছে?

—বন্দুক? আজ্ঞে না স্যার!

—তবে ঠিক আছে, যাও!

বসবার ঘরের মেঝেটি কালো-সাদা মারবেলের, এক পাশে একটা কার্পেট পাতা। দু'দিকে দু'রকম বসার ব্যবস্থা। যেদিকে সোফা-সেট, তার সেন্টার টেবিলে একটা পোরসিলিনের বোলে অনেকগুলি আপেল ও সিঙ্গাপুরী কলা রাখা আছে।

ঝপাস করে একটা সোফায় বসে পড়ে ফলগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে মেজমামা বললেন, শালা, মাটির নাকি?

তারপর বললেন, নাঃ, রিয়েল। নে নীলু, কলা খা! এই কলাগুলোকে এখানে সিঙ্গাপুরী কলা কেন বলে রে? ওখানে কোনোদিন এরকম কলা দেখিনি!

—কী জানি! সবাই তো বলে।

—আপেল-ফাপেল সব শেষ করে দে! ওঃ আবার কায়দা করে দেয়ালে যামিনী রায়ের ছবি টাঙানো হয়েছে! ওটা খুলে নিয়ে যাবো!

—এই সুরঞ্জনবাবু তোমার কী রকম বন্ধু? তোমার কাছ থেকে কখনো কোনো উপকার পেয়েছে কিংবা টাকা ধার নিয়েছে?

—টাকা ও ধার নেবে না, ওদের অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। নর্থ ক্যালকাটায় অনেক সম্পত্তি ছিল, তারই একটা বাড়ি বেচে এখানে এই বাড়ি বানিয়েছে। উপকার, অ্যাঁ, উপকার আমি কারুর কখনো করি না। তবে, কলেজে

পড়ার সময় একবার পিকনিকে গেসলুম বোটানিকসে। সেই সময় এই স্বরঞ্জনটা, ও একদম সাঁতার জানে না, ক্যারদানি করে নৌকোয় চড়তে গেল, তখন জোয়ার ছিল, হঠাৎ নৌকোটার একটা ধার কাত হতেই স্বরঞ্জন একটা পেপার ওয়েটের মতন টপাৎ করে ডুবে গেল। গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে, কী রকম সাঙ্ঘাতিক চেহারা হয় দেখেছিস তো, পাড়ের কাছে পর্যন্ত মানুষ দাঁড়ায় না, নৌকোয় আর তিনজন ছিল, কোনো ব্যাটার সাহস হয়নি সেই জোয়ারের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার। শুধু পিনাকপানি ব্যানার্জি, ইণ্টার-কলেজ স্থইমিং চাম্পিয়ন, এই পিনাকপানি সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরেছিল জলে, বুঝলি! ওর গলা ধরে টেনে তুলেছি। আর একটু হলে স্বরঞ্জনটা মরেই যেত সেদিন, পেটে এত জল ঢুকেছিল যে হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল তিন দিন। একে কি উপকার বলা যায়?

—যে যেমন ভাবে নেয়!

—ঠিক বলেছিস, যে যেমন ভাবে নেয়। এখন যদি পুরো ব্যাপারটাই ভুলে মেরে দিয়ে থাকে, আমি কি জোর করে মনে করাতে পারি?

বসবার ঘরের মাঝখান দিয়েই উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। পুরো পাঁচ মিনিট বাদে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন স্বরঞ্জন দস্তরায়, বাংলা সিনেমার নায়িকার বাবাদের মতন একটা ভেলভেটের ড্রেসিং গাউন পরা, মুখে পাইপ, এক হাতে গেলাশ ভর্তি রঙীন পানীয়। এই ওঁর বিশ্রাম।

নামতে নামতেই তিনি বললেন, ওপর থেকেই গলার আওয়াজ পেয়েছি। প্রথম দিনটা তোর ভাগ্নেকে খুব জ্বালাতন করেছে তো? ওরকম তো হবেই। বী ব্রেইভ ইয়াং ম্যান! আমি অফিসে ছিলুম না আজ, কিন্তু ভেতরে আমার স্পাই আছে, সে খবর দিয়েছে, ইউনিয়ানের লোকেরা আজ ওর সঙ্গে কোঅপারেট করেনি!

জল্লাদের মতন উঠে দাঁড়িয়ে মেজমামা গম্ভীর ভাবে বললেন, স্বরঞ্জন, তোর বউ কোথায়?

স্বরঞ্জন দস্তরায় বললেন, প্রতিমা তো এইমাত্র বাপের বাড়ি গেল! তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি এখনো। তুই আছিস তো কয়েকদিন, এর মধ্যে একদিন তোকে খেতে ডাকবো, সেদিন আলাপ হবে।

—বাপের বাড়ি কত দূরে?

—এই তো কালীঘাটে। কেন বল্ তো?

—টেলিফোন করে ডেকে আনা যায় না?

- তা যায় বটে। এখনো বোধহয় গিয়ে পৌঁছোয়নি। কেন, প্রতিমার সঙ্গে

তোর হঠাৎ কী দরকার পড়লো।

—তাকে তুই শেষবার দু'চোখ ভরে দেখে নিবি!

—আমার বউকে আমি দু'চোখ ভরে দেখবো, না তুই দেখবি? প্রতিমাকে অনেকে এখনো সুন্দরীই বলে।

—আমি বলছি, তুই শেষবার দু'চোখ ভরে দেখে নিবি। তুই আমার ভাগ্নে নীলুকে আজ চরম অপমানের মধ্যে ফেলেছিস। তুই একটা লোকের শুধু শুধু চাকরি খেয়ে সেখানে ওকে বসিয়েছিস। তুই সব জেনেশুনে···কেন রে শালা, আমরা ভিখিরির মতন তোর কাছে চাকরি চেয়েছিলুম? চাকরির কথা একবারও উচ্চারণ করেছি? তুই নিজে সেধে সেধে, ইচ্ছে করে. ওকে বিপদের মধ্যে পাঠিয়েছিস! এই সুযোগে তুই আমাকেও ইনসাল্ট করলি। আমার ওপর তোর বরাবরে হিংসে! কিন্তু আমরা এমনি তোকে ছেড়ে দেবো ভেবেছিস! আমরা দু'জনে মিলে ডিসাইড করেছি, তোর একটা চোখ গেলে দেবো!

প্রথমটায় বেশ অবাক হয়ে সুরঞ্জন দত্তরায় ভুরু তুলে রইলেন। তারপর মুখে একটা পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, তুই আমার বাড়িতে ধেয়ে এসেছিস আমার একটা চোখ নষ্ট করে দেবার জন্য?

মেজমামা দৃঢ়স্বরে বললেন, হ্যাঁ। নাথিং লেস দ্যান দ্যাট।

সুরঞ্জন দত্তরায় নীচের ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, দ্যাখ পিন্টু, তোর বোধহয় মনে নেই, কিন্তু আমি আজও মনে রেখেছি, তুই একবার আমার জীবন বাঁচিয়েছিলি। শিবপুরে আমি গঙ্গায় ডুবে গেসলাম। তুই আমার জীবন বাঁচিয়েছিলি, এখন তুই এসে যদি আমার একটা চোখ নিয়ে নিতে চাস, তাতে আমি আপত্তি করতে পারি না। আমি এত অভদ্র নই। ঠিক আছে, কোন্ চোখটা চাই? ডান চোখ, না বাঁ চোখ! ডান চোখ, না বাঁ চোখ! ইউ ডিসাইড!

মেজমামা আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, বাঁ চোখটাই ভালো? কি বল?

সুরঞ্জন দত্তরায় আবার জোরে জোরে বললেন, ডান চোখ, না বাঁ চোখ? ডান চোখ, না বাঁ চোখ? ভেবে বল্!

মেজমামা বললেন, বাঁ চোখ, বলছি তো!

সুরঞ্জন দত্তরায় এবার এমন জোরে অট্টহাস্য করে উঠলেন যে আমরা দু'জনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। দেয়াল ফাটিয়ে হাসছেন, হাসি থামতেই চায় না।

মেজমামা এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

স্বরঞ্জন দত্তরায় চোখ থেকে চশমাটা খুলে বললেন, এবারও হেরে গেলি। পিণ্টু! বাঁ চোখটা দ্যাখ ভালো করে; পাথরের। ইউরোপে একবার আমার খুব বড অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল মনে নেই? তোকে চিঠিতে জানিয়েছিলুম! কার অ্যাকসিডেণ্টে এই বাঁ চোখটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে ওদেশের খুব ভালো ব্যবস্থা আছে, এমন পাথরের চোখ বসিয়ে দিয়েছে যে বোঝাই যায় না। আমার কোনো খরচই লাগেনি।

আমরা দু'জনেই কাছে গিয়ে দেখলুম, কথাটা মিথ্যে নয়। ওঁর বাঁ চোখটা একেবারে স্থির।

স্বরঞ্জনের দৃষ্টিতে কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, আমার অবচেতনে খটকা লেগেছিল, সেই জন্যই কি ওঁর চোখ গেলে দেবার কথা মনে হয়েছিল আমার?

উনি বললেন, বোস্ বোস্! কী খাবি বল। আমার এই অ্যাকসিডেণ্টটা হয়েছিল, বিয়ের আগে। সুতরাং আমাব বউ প্রতিমাকে কোনোদিনই আমি দু' চোখ ভরে দেখিনি। এক চোখ দিয়ে দেখি বলেই বোধহয় বেশি সুন্দর লাগে। এতদিন ধরে লাগছে!

সোফায় বসে পড়ে তিনি হাঁক দিলেন, বেয়ারা ড্রিংকস লাগাও! ওপর থেকে স্ন্যাকস দিতে বলো।

পাইপটা আবার টানতে টানতে তিনি বললেন, তোকে একটা কায়দা শিখিয়ে দি। একে বলে ফোর্সিং। সাইকোলজিক্যাল ফোর্সিং! তোরা আমার বাঁ চোখের বদলে ডান চোখটাও তো চাইতে পারতি! কিন্তু ঐ যে বার বার বলতে লাগলাম, ডান চোখ না বাঁ চোখ, ডান চোখ না বাঁ চোখ। অধিকাংশ লোক শেষেরটাই বেছে নেয়। আমি যদি বলতুম, চাঁপা না গোলাপ, চাঁপা না গোলাপ, তুই বলতি গোলাপ!

মেজমামা গোমড়া মুখ করে বললেন, হুঁ! তাই বুঝি?

বেয়ারা কয়েকটি গেলাশ, সোডা, জলের বোতল ও ডিকাণ্টার নিয়ে এলো। কলকাতার বড় বড় কোম্পানির ম্যানেজার সাহেবদের বাড়িতে প্রিমিয়াম স্কচ খাওয়ানোই এখন রেওয়াজ, কিন্তু ডিকেণ্টার রাখা খুব বেশি কায়দা!

একটা গেলাশে শুধু পানীয় ঢেলে স্বরঞ্জন দত্তরায় বললেন, এত রাগারাগি কিসের? এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের যা অবস্থা, তাতে যে-কেউ নতুন চাকরিতে জয়েন করলেই সহকর্মীরা গোড়ার দিকে হোস্টাইল থাকে। ভাবখানা যেন এই, এ

আবার কে উড়ে এসে জুড়ে বসলো রে বাবা! দু'চার দিন একটু মানিয়ে চলতে হয়!

মেজমামা বললেন, দু'চারদিন? প্রথম দিনই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এক জায়গায়!

সুরঞ্জন দত্তরায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কোথায়? কারা? এ খবর তো আমার কানে আসেনি? ইউনিয়ানের ছেলেরা ধরে নিয়ে গেলে চমৎকার পুলিশ কেস হবে।

মেজমামা বললেন, ওকে দীনেন বোসের বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল!

—দীনেন বোস? ঐ স্কাউণ্ড্রেলটা আবার গুণ্ডাও পোষে বুঝি?

—শাট আপ! ওর দুটো ফুটফুটে যমজ বাচ্চা আছে, ওকে তুই স্কাউণ্ড্রেল বলছিস কোন্ সাহসে! তোর নিজের ছেলেপুলে নেই? তুই কোন্ কাণ্ডজ্ঞানে ওকে সাসপেণ্ড করলি?

—দ্যাখ পিণ্টু, সুন্দর দেখতে ছেলেপুলে থাকা বুঝি কোনো অফিস ওয়ার্কারের কোয়ালিফিকেশান হতে পারে? ওর যমজ বুঝি? সেটা জানতুম না। কিন্তু অনেকের তো তিন চারটে ছেলে-মেয়েও থাকতে পারে। সো হোয়াট? ঐ দীনেন বোস কী করেছে জানিস?

—কী করেছে?

—কেউ কাজে ভুল করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না? এই জন্যই তো এদেশের অফিস-টফিসের কাজ কর্মের এই অবস্থা! কেউ কাজ করবে না, ফাঁকি মারবে। কিন্তু কিছু বলতে যাও, অমনি স্ট্রাইক। ওয়ার্ক কালচার বলতে কিছু নেই।

—লেকচার মারিস না, রঞ্জু! এই কেসটা কী হয়েছে, সেটা বল।

—দীনেন বোসের কেসটা শুনবি! ঐ দীনেন বোস, ও ধরাধরি করে কাজ পেয়েছিল। মোস্ট ইনএফিসিয়েণ্ট! ফাঁকিবাজ, সীটে থাকে না। সেসবও না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু কত চিঠি যে হারায় তার ঠিক নেই। এর মধ্যে দুটো চিঠি হারিয়েছে, তার মধ্যে একটা সাত লাখ আর একটা একুশ লাখ টাকার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাপার ছিল। তুই জানিস নিশ্চয়ই অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাপার টাইম বাউণ্ড হয়, ঠিক সময়ের মধ্যে মাল ডেলিভারি না দিতে পারলে অর্ডার ক্যানসেল তো হয়েই যায়, উপরন্তু খেসারত দিতে হয়। এতগুলো টাকার ক্ষতি হয়ে গেলেও কম্পানি ওকে কোনো শাস্তি দেবে না, কোলে বসিয়ে আদর করবে?

—সত্যি তোদের কম্পানির অত টাকা ক্ষতি হয়েছে ?

—অফ কোর্স ! তাও তো ওকে আমি জেলে না দিয়ে শুধু সাসপেণ্ড করেছি। মালিক বলেছিল, ও ইচ্ছে করে চিঠিদুটো গাপ্ করেছে, এই অভিযোগ দেখিয়ে ওর নামে থানায় ডায়েরি করতে।

—মালিক জানে যে ওর দুটো ফুটফুটে, সুন্দর, যমজ বাচ্চা আছে ? সে বেচারারা তো কোনো দোষ করেনি ?

—দ্যাখ পিণ্টু, এরকম অদ্ভুত কথা বলিসনি। কারুর যদি খুনের দায়ে ফাঁসি হয়, তখন কি বিচারক দেখতে যাবে যে সেই খুনীর সংসারে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আছে কিনা ! তাহলে তো আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকেই না। যাদেরই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে, তারা মহা আনন্দে যত খুশী বে-আইনি কাজ করে যাবে !

মেজমামা আর কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে নোখ খুঁটতে লাগলেন।

সুরঞ্জন দত্তরায় এবার আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, ইউনিয়ানের ছেলেরা বলছে, ঐ দীনেনের জায়গায় অন্য কোনো লোককে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে দেবে না। আলবাৎ দেবো ! আমাকে অফিস চালাতে হবে না ? আমি আশা করেছিলাম, তোমার বুকের পাটা আছে, তুমি দাপটের সঙ্গে নিজের জায়গা বুঝে নেবে ! তুমি একটুতেই ব্যাক আউট করবে ? হেরে গেলে ?

সুরঞ্জন দত্তরায়কে এত সহজে জিততে দেওয়া যায় না।

আমি এবার বললুম, আপনি আমাকে ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আগে জানাননি কেন ? অন্য একজনের অন্ন মেরে আমি চাকরি করতে চাইবো, একথা আপনাকে কে বলেছে ? এখানে বুকেব পাটার কোনো প্রশ্নই আসে না !

মেজমামা আবার নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, ঠিক ঠিক ! একশোবার ঠিক ! সাপ্রেশান অফ ফ্যাক্‌ট ইজ আ ক্রাইম ! এই চাকরির পেছনে যে এত ঝঞ্ঝাট আছে, সে কথা তুই আগে বলিস নি কেন ? অফিসের অন্য সব স্টাফ দীনেনকে সাপোর্ট করছে, সেখানে নতুন কেউ পোস্টে গিয়ে কাজ করতে পারে ? আমার ভাগ্নে কি ভিখিরি, খেতে পায় না ? তোর পায়ে ধরে চাকরির জন্য সেধেছিল ?

—সব চাকরিতেই এরকম কিছু না কিছু ঝঞ্ঝাট থাকেই !

—তোর ছেলে আছে ? বল, তোর ছেলে আছে ?

—হ্যাঁ, আছে। এবার পার্ট টু দেবে !

—বেশ, ভালো কথা। তুই অফিসের ম্যানেজার হিসেবে একজনের কাজের

গাফিলতির জন্য সাসপেণ্ড করেছিস। বুঝলুম সেটা। কিন্তু ঐ রকম একজনকে সাসপেণ্ড করা পোস্টে কি তুই তোর ছেলেকে চাকরিতে বসাবি কখনো ?

স্বরঞ্জন দত্তরায় উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করতেই মেজমামা তাঁকে আরও চেপে ধরে বললেন, দিতি কি না বল ! ইয়েস অর নো ? ইয়েস অর নো ? ইয়েস অব নো ?

—নো !

—হা-হা-হা-হা ! সাইকোলজিক্যাল ফোর্সিং। একটু আগে তোর কাছ থেকেই শিখেছি। ডান চোখ না বাঁ চোখের মতন, তুই-ও ইয়েস অর নো-র মধ্যে দ্বিতীয়টা বেছে নিলি। নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিয়েছিস চাঁদু ! যে-রকম জায়গায় তুই নিজের ছেলেকে পাঠাতিস না, সেরকম জায়গায় তুই আমার ভাগ্নেকে পাঠালি কেন ? বল, বল, উত্তর দে !

এবার স্বরঞ্জন দত্তরায়ও চুপ করে গেলেন।

মেজমামা বললেন, তা হলে তুই আমাদের সঙ্গে চিটিং করেছিস, এটা স্বীকার করছিস ?

স্বরঞ্জন দত্তরায় এক চুমুকে নিজের গেলাশের পানীয় শেষ করে বললেন, তুই কিছু খাচ্ছিস না, পিন্টু ? সিভাস রিগ্যাল !

মেজমামা বললেন, আমাকে স্কচের লোভ দেখাসনি ! আমাদের দেশে শস্তার বাংলা মদ যা, সিঙ্গাপুরে স্কচও তাই। তুই যখন আসবি, তখন তোকে প্রিমিয়াম স্কচে চোবাবো ! এখন বল, তুই আমাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলি কেন ? নীলু বেচারা এমন শক পেয়েছে, বাড়িতে এসে বলছে যে, জীবনে আর কোনো-দিন কোনো চাকরিতে যাবে না !

—আই মাস্ট কম্‌পেনসেট দেন। আমি আর একটা প্রস্তাব দেবো ?

—কী শুনি ?

—আজ আমাদের কম্পানির গোডাউন ইনস্‌পেকশনে গিয়েছিলুম। ওখানে জনা বারো স্টাফ আছে। আজ গিয়ে বুঝলুম, ওখানে একটা টাইম কীপারের পোস্ট ক্রিয়েট করা দরকার। একজন কেউ অফিসার শ্রেণীর থাকবে, যে অন্য স্টাফদের আসা-যাওয়ার দিকে নজর রাখবে !

—শুনেই মনে হচ্ছে বাজে কাজ !

—না রে, না ! একটা আলাদা ঘর থাকবে গোডাউনের গেটের কাছে। কাজ খুব হালকা। শুধু বসে থাকা। যে-যখন আসবে-যাবে টাইম নোট করে রাখা। অন্য সময়ে সে ইচ্ছে করলে গল্পের বই পড়তে পারে। এই কাজটা নীলু করতে

পারবে না ? মাইনে একই পাবে !

মেজমামা ও সুরঞ্জন দত্তরায়ের পরবর্তী কয়েকটা সংলাপ আমি শুনতে পেলুম না। আমার চোখ চলে গেছে সিঁড়ির দিকে। নীল শাড়ি পরে কেউ নেমে আসছে ওপর থেকে, প্রথমে দেখা যাচ্ছে শুধু পা। বুকটা ধক করে উঠলো। নীলা ? এখানে, এই বাড়িতে নীলা কী করে আসবে, সে প্রশ্নও আমার মনে জাগলো না।

মেজমামা আমার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, কী রে, তুই শুনছিস না ? এ প্রস্তাবটা তো ভালোই মনে হচ্ছে !

আমি চমকে উঠে বললুম, কী ?

মেজমামা বললেন, দমদমের এই পোস্টটা। তুই একলা একটা ঘর পাবি। কেউ তোকে ডিসটার্ব করবে না। সব সময় মাথার ওপর কোনো বস্‌ও থাকবে না। ছোড়দি কত খুশী হবে বল্। ছোট ছেলে চাকরি পেয়েছে শুনে তোর মা কাল যেমন খুশীতে ডগমগ করছিল, আজ তেমনি নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। এখন গিয়ে বলতে পারবো, নীলুর চাকরি ঠিকই আছে। নীলু সম্মানের সঙ্গেই চাকরি করবে।

সুরঞ্জন দত্তরায় বললেন, এই চাকরিটা তুমি নিশ্চিন্তে নিতে পারো, নীলু। একদম নতুন পোস্ট। তোমার মনে কোনো গিল্টি কমপ্লেক্স থাকবে না। তা ছাড়া, যত ছোট অফিস, তত ঝামেলা কম।

—তুই ঠিক বলছিস, রঞ্জু ? এ চাকরির পেছনে কোনো গ্যাঁড়াকল নেই ?

—আই প্রমিস ! ঠিক আছে, এক কাজ করা যেতে পারে। কাল সকালে আমার গাড়িতে তোকে আর নীলুকে তুলে নেবো। আমি নিজে নীলুকে সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বসিয়ে আসবো চেয়ারে। তুই-ও দেখেশুনে বুঝে আসতে পারবি, পিণ্টু, অবস্থাটা।

—তাহলে তো খুব ভালো কথা। আমি নিজে দেখলে অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবো !

—তোর দিদির বাড়িতে আমি হাজির হবো ঠিক পৌনে আটটার সময় !

আমার চোখ চলে গেছে আবার সিঁড়ির দিকে। নীল শাড়ি নয়, চওড়া নীল পাড়, বাকি অংশটা জংলা ধবনের। যে নেমে আসছে, সে নীলা নয়। অন্য একজন।

এবার আমার স্থির দৃষ্টি অনুসরণ করে মেজমামা এবং তাঁর বন্ধুও মুখ ফেরালেন। মেজমামা চমকে উঠে বললেন, ও কে ?

সুরঞ্জন দত্তরায়ের মুখে যেন একটা মেঘের ছায়া পড়লো। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, আমার বড় মেয়ে !

মেজমামা বললেন, অবিকল যেন তোর মায়ের মুখখানা বসানো ! শেষ যে-বার তোর মাকে দেখি, তখনো যেন তাঁর একটুও বয়েস বাড়েনি !

সুরঞ্জন দস্তরায় আরও আস্তে, করুণ গলায় ফিসফিস করে বললেন, আমার মেয়ে শ্রেয়া, ঠিক সুস্থ নয়। শী ইজ আ মোঙ্গল চাইল্ড, অনেক জিনিসই এখনো বোঝে না। ও যদি তোদের সঙ্গে ঠিক মতন ব্যবহার না করে, তোরা কিছু মনে করিস না। আমারও সমস্যা কম নয় রে, পিণ্টু !

তারপর তিনি মুখ তুলে বললেন, শ্রেয়া এদিকে এসো। তোমার একজন আংকল এসেছেন বিদেশ থেকে।

মেয়েটি কোনো ভ্রূক্ষেপও করলো না। মাটির দিকে চেয়ে, কিছু যেন একটা খুঁজতে খুঁজতে বসবার ঘরে দু'এক পাক ঘুরলো, তারপর চলে গেল পেছনের একটা দরজা খুলে।

তার বাবা ও মেজমামা আরও দু'একবার তাকে ডাকলেন কাছে। কিন্তু সে যেন শুনতেই পেল না কোনো ডাক।

এরপর ওঁরা দু'জনে ছেলেমেয়েদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে লাগলেন একটু-ক্ষণ। আমি চিন্তা করতে লাগলুম নীলার কথা।

নীলা আজ শেষ কথা বলেছিল, আমাকে ধরে রাখো, চলে যেতে দিও না !

আমি সে কথার অর্থ বুঝতে পারিনি।

একটুবাদে মেজমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল নীলু, এবার বাড়ি যাওয়া যাক।

সুরঞ্জন দস্তরায় বললেন, তা হলে ঐ কথাই রইলো, কাল সকালে আমি তোদের তুলে নিচ্ছি। নো মোর ব্যাড ফিলিংস ?

মেজমামা বললেন, নো মোর ব্যাড ফিলিংস ! তবে, একটা শুধু খটকা রয়ে গেল, রঞ্জু ! তুই যে ফোর্সিং-এর কথা বললি তখন, ওটা সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই খাটে না। আমি যদি বলতুম, তোর ডান চোখটা চাই। তাহলে তুই কী করতিস ?

সুরঞ্জন দস্তরায় বললেন, সে উত্তরটাও আমার রেডি ছিল। ভেরি সিম্পল ! তুই বাইচান্স ডান চোখ চাইলি তখনো আমি চশমাটা খুলে বাঁ চোখটা দেখাতুম। তারপর বলতুম, ডান চোখটা খুবলে নিলে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে যাবো। তোরা তো আমাকে শুধু কানা করতে চেয়েছিস, অন্ধ করতে তো চাসনি। ডান চোখটা নিলে তোদের কথার খেলাপ হয়ে যাবে !

মেজমামা বললেন, নিয়তির কি বিচিত্র কারখানা ! এক এক সময় একটা পাথরের চোখও কত কাজে লেগে যায় !



এই ঘরখানা পছন্দ না করে উপায় নেই।

একটু দূরে দুটি পেল্লায় চেহারার গুদাম। অর্ধগোলাকার, ওপরে টিনের ছাউনি। একটাতে থাকে নানারকম ওষুধ পত্তর, অন্যটিতে গজ-ব্যাণ্ডেজ, তুলো, স্টিচিং প্লাস্টার, নী-ক্যাপ, ডেটল ইত্যাদি। কম্পানির কারখানা থেকে এইসব জিনিস এখানে এনে জমা করা হয়, আবার বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই হয়ে যায়। সে সব কি আসছে না যাচ্ছে, তা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় না, তা দেখার অন্য লোক আছে। আমি ঐ গুদাম দুটোর মধ্যে একবারও ঢুকিনি।

আমার কাজটা বলা যায় এক ধরনের গ্লোরিফায়েড দারোয়ানের।

কিংবা টাইম-বাবু বলা যেতে পারে। কিংবা নিজেকে আমি বড়বাবুও ভাবতে পারি। আমার হাতে বেশ ক্ষমতা আছে। বাইরে থেকে যত লোক এখানে ঢুকবে কিংবা বেরুবে, আমার সঙ্গে দেখা না করে তাদের যাবার উপায় নেই। তাদের নাম ঠিকানা লিখে, তাদের হাতে একটা চিরকুট দিলে তবে দু'দিকের দারোয়ান তাদের ছাড়বে। এখানে কম্পানির যে-ক'জন নিজস্ব স্টাফ তাদের সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। তাদের আসা-যাওয়ার সময় লিখিয়ে যেতে হবে আমার কাছে। ছুটির সময় তারা যখন বেরুবে, তখন আমার মনে কোনো সন্দেহ হলে আমি দারোয়ান দিয়ে তাদের বডি সার্চ করাতে পারি। কিন্তু আমার বডি কেউ সার্চ করবে না। সেই হিসেবে আমি বড়বাবু!

মূল লোহার গেটের থেকে খানিকটা দূরে আমাকে একটা চমৎকার ঘর দেওয়া হয়েছে। ঘরটা খানিকটা উঁচুতে, দোতলার মতন, যদিও একতলায় কিছু নেই, শুধু পিলার। আমার ঘরের তিন দিকে বড় বড় কাচের জানলা। পুরো গুদাম এলাকাটা যদিও দেড় মানুষ সমান দেয়াল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু আমার ঘর থেকে বাইরেটাও দেখা যায়।

সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বাঁ দিকটা। দেয়ালের ওপাশেই অনেকখানি জলাভূমি, কচুরি পানায় পুরোটা ভরা, মাঝে মাঝে কিছু লাল শালুকও রয়েছে, যতদূর চোখ

যায়, শুধু সবুজ। কত রকম ফড়িং, বক, শালিক আর শঙ্খচিল ওড়াউড়ি করে সেই জলার ওপর। ওদিকে একটা ছোট বারান্দাও আছে। সেখানে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে আমি চোখ জুড়োই!

আমি এই ঘরটার নাম দিয়েছি জলটুঙ্গি।

কাজ সত্যি বেশ কম। নিজস্ব তেরজন স্টাফ ছাড়া বাইরের মানুষ পাঁচ-সাত জনের বেশি আসে না। খুচরো বিক্রির তো ব্যাপার নেই এখানে।

অনায়াসেই আমি এখানে মাঝে মাঝে বই পড়তে পারি। ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়েও নেওয়া যায় দুপুরের দিকে। তিন চারদিনের মধ্যেই রেকর্ড কিপিং, টোকেন দেওয়া, খাতা লেখা রপ্ত হয়ে গেল। আর কেউ আমার ঘরে বসে না। আমার মাথার ওপর খবরদারি করার মতনও কেউ নেই, এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! এরকম একটা চাকরি অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়।

দিন পাঁচেক বাদে দুপুরবেলা একজন আমার ঘরে ঢুকে বললো, নমস্কার স্যার, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম। আপনার অসুবিধে নেই তো!

লোকটির বয়েস আমার অন্তত দেড়গুণ হবেই, জামা-কাপড় ও মুখের চেহারা দেখলে মধ্যবিত্ত, ভদ্রশ্রেণীর বলেই মনে হয়। তবে আমাকে স্যার বলছে কেন? আমাকে কি সত্যি সত্যি অফিসার ভেবেছে নাকি?

আমি বললুম, বসুন, বসুন, কোনো অসুবিধে নেই।

সামনের চেয়ারটায় বসে তিনি বললেন, আমার নাম মিথিলেশ্বর রায়, আমাকে সবাই এখানে মিথিলাবাবু বলে ডাকে।

আমি বললুম, বেশ নতুন ধরনের নাম।

মিথিলাবাবু বললেন, আমি এখানকার স্টোরকিপার। নিন, সিগারেট খান তো!

ভদ্রলোকের গায়ের জামাটা ওভার অল ধরনের। হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা, অন্তত গোটা ছয়েক পকেট। তার এক পকেট থেকে দুটি দামি বিলিতি সিগারেটে প্যাকেট বার করে একটা ঠেলে দিলেন আমার দিকে।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, পুরো প্যাকেট? না, না, লাগবে না।

—রাখুন না, রাখুন! ওটা খুলতে হবে না এখন, আমারটা থেকে নিন!

—এত দামি সিগারেট খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। শুধু শুধু নষ্ট হবে!

—আরে মশাই, সব সিগারেটই এক। নেশার দ্রব্য পেলেই হলো। ও নিয়ে

মাথা ঘামিয়ে কী লাভ ! আপনি এই প্রথম নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ, মানে, ঠিক প্রথম নয়। দ্বিতীয় বলতে পারেন। এর আগে একদিনের জন্য আর এক জায়গায়।

—হেড অফিসে তো ? দীনেন বোসের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিল তো ? খুব বেঁচে গেছেন, ভালো জায়গায় ট্রান্সফার করেছে। এখানে আরামে কাজ করতে পারবেন। নিন, এগুলোও রাখুন !

মিথিলাবাবু অন্য পকেট থেকে বার করলেন আট-দশ পাতা ওষুধ।

—এগুলো কি !

—অ্যাণ্টাসিড ! আপনার অম্বলের প্রবলেম নেই ?

—না তো !

—তা হলে আপনি তো লাকি লোক ! বাড়ির অন্য লোকের কাজে লাগবে, রেখে দিন।

—আমাদের বাড়িতে কারুকে কখনো অ্যাণ্টাসিড খেতে দেখিনি।

—তা হলে আমাশার ওষুধ লাগবে তো ? আমাশায় ভোগে না, এমন বাঙালী হতেই পারে না। আপনার যদি এখনো না হয়ে থাকে, বাড়িব বয়স্কদের নিশ্চয়ই হয়েছে দেখুন গে ! আরে মশাই, ওষুধের ডিপোয় কাজ করছেন, আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে ওষুধ কিনবেন, তা কি হয় ? লোকে শুনলে ছ্যা ছ্যা করবে যে ! আপনি এর মধ্যে একদিনও আমাদের কাছ থেকে কিছু চাইলেন না, তাই ভাবলুম, লাজুক মানুষ, নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি।

—মিথিলাবাবু, আমাদের বাড়িতে কেউ বিশেষ ওষুধ খায় না। শুধু শুধু নষ্ট করার তো কোনো মানে নেই। তাছাড়া, আমি তো শুনেছি, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ খেতে নেই যখন তখন।

—আপনি মশাই ছেলেমানুষ। এই সব ছোটখাটো অসুখের জন্য ডাক্তারদের কেউ পয়সা দেয় ? ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন মেনে যদি সবাই ওষুধ খেত, তা হলে এইসব ওষুধ কম্পানিগুলো চলতো কী করে ? নাইন্টি পারসেণ্ট ওষুধই তো বিনা প্রেসক্রিপশনে বাজারে কাটে ! নিন, আপনার ভিটামিন লাগবে তো !

—আরে করছেন কী ! এত ওষুধ নিয়ে আমি কী করবো ? না, না, আমার লাগবে না।

—আপনি ভাবছেন, কম্পানির জিনিস বিনা পয়সায় নিচ্ছেন ? সেটা খারাপ কাজ ? আরে দাদা, স্টোরেজ অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্টের জন্য সব আইটেমে ফাইভ

পার্সেন্ট ড্যামেজ ধরে রাখা হয়। ফাইভ পার্সেন্ট কি কম নাকি? অত ওষুধ আমি ড্যামেজ করবো কী করে? হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কিংবা জল ঢেলে ফাইভ পার্সেন্ট নষ্ট করবো? তার চেয়ে যদি নিজেদের বাড়িতে কাজে লাগে, তাতে ক্ষতি কি?

—ফাইভ পার্সেন্ট নষ্ট করতেই হবে, এমন কোনো নিয়ম আছে? নষ্ট না হলে কম্পানির তো খুশী হওয়ারই কথা।

– মাথা খারাপ! কম্পানিকে খুশী করতে গিয়ে প্যাঁচে পড়ি আর কি? মনে করুন, এবার কিছু নষ্ট হলো না। সব ঠিকঠাক রইলো। কম্পানির বড় সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বলে গেল, বাঃ বাঃ! তারপর একটা কনসাইনমেণ্টে সত্যি সত্যি অনেকখানি ড্যামেজ হলো, তখন ঐ বড় সাহেবই এসে চোখ রাঙিয়ে বলবে, আগের বার নষ্ট হয়নি, এবার হলো কী করে? সব তোমার দোষ! বুঝুন ঠ্যালা!

—তা হলে নষ্ট করতেই হবে বলছেন?

—রেগুলার পাঁচ পার্সেন্ট বরাদ্দ করে দিতে হবে। সেগুলো যদি আমরা বাড়িতে নিয়ে যাই, তাতেই বা দোষ কী বলুন!

—আপনিই তো বললেন, ফাইভ পার্সেন্ট মানে অনেক ওষুধ। মাত্র তের জন স্টাফ। এত সব ওষুধ এই ক'জনে বাড়িতে নিয়ে গেলে, ভাত-টাত আর খেতে হবে না। শুধু ওষুধ খেয়েই পেট ভরে যাবে, তাই না!

—ওসব নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনার যখন যা লাগে বলবেন। আপনাকে শুধু একটা ফেবার করতে হবে। করবেন তো, বলুন!

—কী বলুন!

—আপনাকে আমাদের ওপর পাহারাদারি করার জন্য বসিয়েছে। দুপুরে এক-বার বাইরে বেরুতে হলেও আপনার কাছ থেকে পাশ নিতে হবে। ঠিক আছে, আপনার কাছ থেকে পাশ নিয়ে যাবো। এসে ফেরৎ দেবো। আপনি শুধু খাতায় নোট করবেন না। কোনো রেকর্ড রাখবেন না, ব্যাস! চাকরি করছি বলে কি দশটা-পাঁচটা জেলখানায় বন্দী থাকতে হবে?

—বাইরে যাওয়ার তো নিষেধ নেই। খাতায় নোট রাখলে অসুবিধে কি?

—রেকর্ড রাখতে নেই, রেকর্ড রাখতে নেই! হেড অফিসের বাবুরা যে দুপুরে হাওয়া খেতে বেরোয়, তার কোনো রেকর্ড থাকে!

কে যেন বাইরে থেকে চিৎকার করে ডাকলো, মিথিলাদা! ও মিথিলাদা!

মিথিলাবাবু উঠে পড়ে বললেন, যাই, কেন ডাকছে দেখি? মনে রাখবেন কথাটা। কাল দুপুরেই আমার একটা দরকার আছে!

মিথিলাবাবু উঠে যেতেই আমি ওষুধের পাতাগুলো ফেলে দিলুম ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে চেয়ে রইলুম একদৃষ্টিতে। ওটা ফেলতে হাত উঠছে না। পয়সা দিয়ে রোজ ওষুধ কিনতে হয় না, কিন্তু পয়সা দিয়ে রোজ সিগারেট কিনতে হয়।

ওষুধ কম্পানির গোডাউনে তো সিগারেট থাকতে পারে না। এত দামি সিগারেট মিথিলাবাবু পেলেন কোথায় ?

বিকেলের দিকে আবার আর এক কাণ্ড হলো।

পল্টু এখানকার একজন ক্লাস ফোর স্টাফ। চাকরির যে এত ক্লাস থাকে তাই-ই জানতুম না আগে। আমি ক্লাস থ্রি, পল্টু ক্লাস ফোর। যে যত উঁচু ক্লাসের, তার তত ছোট চাকরি !

পল্টু আজ একটু আগে ছুটি চায়। তা যাক না আগে, আমার তাতে আপত্তি করবার কী আছে ? কিন্তু টিকিট লিখে খাতায় নোট করতে আমি পল্টুর দিকে বার বার না তাকিয়ে পারলুম না ! তার চেহারাটা বেঢপ হয়ে গেছে। পেটটা গর্ভিনী নারীর মতন, দু'পায়ে গোদ !

পল্টু অভিমানের স্বরে বললে, দেখছেন কি স্যার ! মাত্র কয়েকখানা গজ-ব্যাণ্ডেজ নিয়েছি। কতই বা দাম হবে এর, কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশি দেবে না !

সুরঞ্জন দত্তরায় আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কোনো কর্মচারি এখান থেকে বেরুবার সময় জিনিসপত্র সরাচ্ছে এমন সন্দেহ যদি আমার হয়, তাহলে তার টিকিটে দুটো দাগ দিতে হবে। দারোয়ান তাই দেখে তাকে সার্চ করতে বাধ্য।

পল্টু আবার অভিযোগ করে বললো, আমাদেরটায় শুধু গজ-ব্যাণ্ডেজ ছাড়া আব কিছু স্টক নেই এখন। আর ওদের কত সুবিধে বলুন ! হার্টের ওষুধ দু'তিন পাতা নিলে বুক পকেটে এঁটে যায়, কেউ বুঝতেও পারে না, অথচ তার দামই একশো টাকা !

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পল্টু বললো, টিকিটে দাগ দেবেন না, স্যার ! এখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার পাঁচ জনের সংসার। দেশে বাবা-মা আছে, সেখানে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হয়। কেটে কেটে বারো শো টাকা মাইনে পাই, তাতে দুটো সংসার চলে এই বাজারে ? আপনিই বলুন, স্যার। কিছু উপরি রোজগার না থাকলে না খেয়ে বউ-বাচ্চা মারা যাবে। এই মাসে আবার মায়ের

অসুখের খবর পেয়ে মাইনের সব টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। হাত একেবারে খালি। আজ চাল কিনে নিয়ে না গেলে হাঁড়ি চড়বে না! কী জানি, মা এতক্ষণ বেঁচে আছে কি না!

গ্লিসারিন ছাড়াই চোখে জল এনে ফেললো পণ্টু।

আমি বললুম, কিন্তু তুমি যা চেহারা করেছো, দারোয়ানরা তোমাকে দেখেই তো বুঝে ফেলবে।

চোখ মুছে পণ্টু বললো, তা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। সে আমি ম্যানেজ করবো।

পরীক্ষা করার জন্য আমি পণ্টুর টিকিটে দাগ না দিয়েই ছেড়ে দিলুম।

তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়ালুম ডান দিকের জানলার কাছে। এখান থেকে মেইন গেটটা স্পষ্ট দেখা যায়।

পণ্টু গেটের কাছে পৌঁছোতেই একজন দারোয়ান হাত বাড়িয়ে তার টিকিটটা নিল। উল্টে পাল্টে দেখলো ভালো করে। তারপর পণ্টুর চেহারা দেখে হাসলো। বাড়িয়ে দিল আর একটা হাত।

পণ্টু সেই হাতে একটা দশ টাকাব নোট গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল নাচতে নাচতে।

নাঃ, বেশ চমৎকার ব্যবস্থা।

এখান থেকে বরাবরই এরকম চুরি যায়। কম্পানি তা জানে। সেই চুরি আট-কাবার জন্য কম্পানি আমাকে এই জলটুঙ্গিতে বসিয়েছে। কিন্তু এই চুরি রোধ করার সাধ্য কি আমার আছে?

প্রত্যেকেই এসে আমার কাছে নানারকম দুঃখের গল্প বলে। বাবার অসুখ, মায়ের অসুখ। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার খরচ, কারুর ইলেকট্রিকের বিল এ মাসে তিন গুণ হয়ে গেছে, কারুর বা হারিয়ে যাওয়া রেশন কার্ড পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে। কত রকম সমস্যা। সংসার চালাতে গেলে পদে পদে অতিরিক্ত খরচ, অথবা ঘুষ দিতে হয়। তা হলে বাঁধা মাইনের উপার্জনে চলবে কী করে?

কেউ কেউ এসে আবার অন্যের নামে নিন্দে করে যায়। একজন এসে মিথিলাবাবুর নামে একটা সাঙ্ঘাতিক কথা বললো। ওঁর নাকি দুটো বিয়ে। গোপন দ্বিতীয় সংসারটা বরানগরে। সেইজন্যই প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে একবার বেরিয়ে সেখানে ঘণ্টা দু'এক কাটিয়ে আসেন।

বাবাঃ, ভদ্রলোক দুটো সংসার চালান, তার ওপরেও বিদেশী সিগারেট ছাড়া খান না! কত রোজগার কে জানে!

এই রকমই চলতে লাগলো। আমি কারুর টিকিটে দাগ দিই না। পাঁচ পার্সেণ্ট ওষুধ নষ্ট হবেই বলে ধরা আছে। সেই পাঁচ পার্সেণ্ট মানে কত তা কে জানে! সেই ওষুধ এখানকার কর্মচারিরা সত্যি সত্যি নষ্ট করুক কিংবা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো খেয়ে পেট ভরাক, কিংবা বাজারে বিক্রি করুক, তাতে আমার কী আসে যায়?

বিপদ এলো অন্য দিক দিয়ে।

কাল থেকে একজন নতুন দারোয়ান এসেছে। বয়েস বেশি না, বেশ চটপটে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, নাকের নীচে মস্ত বড় গোঁফ, এমন দুর্বোধ্য হিন্দী বলে যে বোঝাই যায় না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা সে আলাপ করতে এলো আমার কাছে। খাঁকি প্যাণ্ট ও শার্ট পরা, দরজার সামনে জুতো ঠুকে একটা মস্ত বড় স্যালুট করে বললো, আপকা সাথ থোড়া কুচ পেরাইভেট বাৎ হ্যায়, সাব!

আমি বললুম, আইয়ে, আইয়ে!

সে ভেতরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর কাচের জানলাগুলোর পর্দা টেনে ঢেকে ঘর প্রায় অন্ধকার করে দিল একেবারে।

আমার বুক কেঁপে উঠলো। এ আবার কী ব্যাপার? লোকটা কি আমাকে মারবে নাকি?

দারোয়ানটি একটা চেয়ার টেনে বসার পর মাথা থেকে টুপি খোলার মতন টেনে তুলে ফেললো সমস্ত চুল। চুল নয়, পরচুল। ওর মাথা জোড় চকচকে টাক। একটানে ছিঁড়ে ফেললো মোটা গোঁফ। সেসব টেবিলের ওপর রেখে পরিষ্কার বাংলায় বললো, ওঃ কী গরম! এগুলো পরে থাকা দারুণ ঝামেলা!

এবার আমার দিকে হ্যাণ্ড সেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার নাম সহদেব পাল। আমি কম্পানির ভিজিলেন্স অফিসার। আপনার থেকে আমার র‍্যাঙ্ক একটু উঁচুতে। আমি ক্লাস টু!

আমি হঠাৎ তোতলা হয়ে গেলুম।

—আপনি···আপ···নি···আপ···নি· ·দারোয়ান সেজে থাকেন?

—ওনলি ফর ওয়ান মান্থ! ঠিক এক মাস থাকবো! এর মধ্যে আমার দুটো কাজ। কে কতটা চুরি করছে, সেটা ওয়াচ রাখা। আর একদিন আগুন ধরিয়ে

দেবার ব্যবস্থা আছে।

—আগুন ?

—হ্যাঁ। আগুন। আপনি আর আমিই এখানে হেড অফিসের লোক। আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার। এ মাসের মাঝামাঝি একটা ওষুধের লটের তারিখ এক্সপায়ার করে যাবে। তখন সেই ওষুধ তো আর বাজারে চালানো যাবে না! প্রায় দেড় লক্ষ পীস সেই ওষুধের কী হবে ? কম্পানি কি পুরো টাকাটা লস্ খাবে ? আমার ওপর ভার পড়েছে, খুব সিক্রেটলি সেই ওষুধের লট্‌টায় আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। তারপর পুরো টাকাটা ক্লেইম করতে হবে ইনসিওরেন্স কম্পানির কাছ থেকে।

—এরকম হয় বুঝি ?

—আকছার হয়। বছরে দু' বার আগুন লাগা আলাউড। আস্তে আস্তে সব শিখবেন। আর একটা কথা, এখানে কে কত চুরি করছে, সেটা আমি নোট রাখছি। এখন কারুকে আটকাচ্ছি না। পরে হুড়কো দেওয়া হবে। এখন নিচ্ছে নিক। আপনি কত পার্সেণ্ট পাচ্ছেন ?

—অ্যাঁ ? আমি···আমি···

—লক্ষ্য করছি, আপনি কোনো টিকিটেই চেকিং মার্ক করছেন না। আপনার তো খুব সুবিধে, বসে বসেই রোজগার। ওরা কত করে দিচ্ছে আপনাকে ? ক্যাশ নিচ্ছেন, না কাইণ্ড ?

—আমাকে দেবে কেন ?

—আমার সঙ্গে ন্যাকামি করবেন না, নীললোহিতবাবু! আমরা দু'জনেই হেড অফিসের লোক। আমাদের মধ্যে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং থাকা দরকার। আপনি যা পাচ্ছেন, তার আদ্ধেক আমাকে দেবেন। আমি কোনো হিসেব চাইবো না। গুড ফেইথে ছেড়ে দিচ্ছি আপনার ওপর।

—মিঃ পাল, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু নিই না। আমি কারুর সাতে পাঁচে থাকি না।

—এটা বিশ্বাস করা শক্ত। আপনি এই ঘরে বসে বসে অতিরিক্ত রোজগার করবেন, আমি দারোয়ান সেজে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকবো শুধু শুধু! ভিজিলেন্সে কাজ করি বলে কি আমি মানুষ না ? আমি আমার শেয়ারটা পাবো না ?

—ঠিক আছে, দেখবেন, এবার থেকে কারুর ওপরে সন্দেহ হলেই আমি তার টিকিটে মার্ক করবো। তারপর দারোয়ানরা যা পারে, তা করবে! শুনেছি,

দারোয়ানদের রোজগারই অনেক বেশি।

—আমি দারোয়ান সেজে থাকলেও আমি উচ্চবংশের ছেলে। ওদের কাছ থেকে ছিনিমিনি করে নিতে আমার প্রেস্টিজে লাগবে। আপনি যদি এ পর্যন্ত কিছু না নিয়ে থাকেন, ঠিক আছে, আজ থেকে নেওয়া শুরু করুন, কারুকে ছাড়বেন না। যা পাবেন, তার ভাগ দেবেন আমাকে! সবাই নেয়, আমরা নেবো না কেন? আমাদের দুজনের ওপর চেক করার কেউ নেই!

—মাপ করবেন, আমার দ্বারা এসব হবে না।

—ঠিক আছে। আমি ওয়াচ রাখবো। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব শক্ত!

আমাকে বেশ একটা শাসানি দিয়ে সে আবার গোঁফ আর মাথার চুল পরে নিল। রাগ-রাগ করে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি এখানে আসবো মাঝে মাঝে! আমার কথা আর কারুকে যেন বলে দেবেন না!

লোকটি চলে যাবার পর আমি জলাভূমির দিকের বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

নিঃশ্বাস ভারি ভারি লাগছে। জর এলো নাকি? এই জায়গায় আর বেশি-দিন চাকরি করলে আমার টিবি, ম্যালেরিয়া, অর্শ, ভগন্দর, হাড মুড়মুড়ি ব্যামো, এরকম অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে।

মেজমামা চলে গেছেন মুর্শিদাবাদ, এক্ষুনি আমি এই চাকরিতে লাথি মেরে দিকশূন্যপুরে চলে যেতে পারি। কেউ আর আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু ঐ তিন হাজার টাকার জন্য বড্ড লোভ লাগছে। কোনো রকমে দাঁতে দাঁত চেপে একটা মাস চালানো যাবে না? এক মাস পূর্ণ না হলে বোধহয় কিছুই মাইনে দেবে না।

সহদেব পাল নামে লোকটা মুখের ওপর আমাকে চোর বলে গেল। তবু যে আমি ওকে একটা ঘুঁষি মারতে পারলুম না, তার কারণও ঐ তিন হাজার টাকার টান। এই মাস মাইনের লোভেই লোকে আস্তে আস্তে চাকরিজীবনের দাস হয়ে যায়।

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবার এখান থেকে সরে পড়লেই হয়। মাস শেষ হতে আর বাকি আছে বারোদিন। তার মধ্যে দুটো রবিবার। এই কটা দিন কোনোরকমে কেটে যাবে ঠিকই।

সহদেব পালকে জব্দ করার জন্যে আমি এর পর থেকে প্রত্যেকের বাইরে

যাবার টিকিটে দুটো করে দাগ দিতে লাগলুম। এবার দারোয়ানরা বুঝুক। আমি দাগ দিলে ওরা সার্চ করতে বাধ্য। তারপর কী কী পেল না পেল, তার হিসেব রাখাও ওদের দায়িত্ব। সহদেব পাল দারোয়ান সেজে থাকতে পারে, অথচ অন্য দারোয়ানদের কাছ থেকে ঘুষের ভাগ নিতে প্রেস্টিজে লাগবে!

মিথিলাবাবুর টিকিটে দাগ দিতেই তিনি আঁতকে উঠে বললেন, এ কী করছেন স্যার! আমি কী করেছি? আমার রেকর্ড খারাপ করে দিচ্ছেন!

গম্ভীরভাবে বললুম, আমি নিরুপায়। কম্পানির অর্ডার এসেছে। বাইরে যাবার সময় প্রত্যেককে সার্চ করতে হবে।

মিথিলাবাবু বললেন, আমার কাছে কোনোদিন কিছু থাকে না। আপনি দেখুন, সার্চ করে দেখুন! আমার টিকিটে কক্ষনো দাগ পড়েনি।

আমি বললাম, মাপ করবেন, সার্চ করা আমার কাজ নয়। সেটা দারোয়ানরা করবে। তারা বুঝবে। আমাকেও প্রত্যেকদিন সার্চ করা হবে!

মিথিলাবাবু বললেন, আপনি মশাই ক্ষেপে গেলেন নাকি? তিলকে তাল করছেন দেখছি! এখানে এমন কিছুই হয় না। কম্পানি মোটা লাভ করছে কী করে তবে?

আমি বললুম, সেসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার যেটুকু ডিউটি সেটা আমি করে যাচ্ছি!

মিথিলাবাবু রাগ করার বদলে মুচকি মুচকি হাসলেন। দুবার বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

পরেরদিন তিনি চরম আঘাত হানলেন আমার ওপরে।

আমার এই সুন্দর ঘরটার একটাই অসুবিধে, সঙ্গে বাথরুম নেই। ছোটবাইরে যেতে হলেও আমাকে যেতে হয় অনেকটা হেঁটে, গুদামগুলোর পেছনে, কমন বাথরুমে।

দুপুরবেলা একবার সেই বাথরুম থেকে ঘরে ফিরেই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল!

আমার টেবিলের ওপরেই দুটো বেশ বড় প্যাকেট। মোটা খয়েরি কাগজের প্যাকিং বক্স। হলুদ নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। পাঁচ মিনিট আগেও এ দুটো এখানে ছিল না।

আমার শরীর কাঁপছে। মাত্র কয়েকদিনের চাকরিতে বড় বেশি রকমের অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে, এতটা হজম করা শক্ত। এসব ঝঞ্ঝাট তো গল্পের বইয়ের

চরিত্রদের হয়, আমার ওপর কেন বাবা? মাত্র একটা মাসও সুস্থিরভাবে চাকরি করতে দেবে না!

ভয়ের কাঁপুনি সত্ত্বেও কৌতূহল দমন করা যায় না। সন্তর্পণে দড়ির গিঁটগুলো খুললুম। একটার মধ্যে থরে থরে সাজানো ওষুধ। সাধারণ অ্যাণ্টাসিড-ফ্যাসিড নয়, দেখলেই বোঝা যায় সবগুলোই দামি। আর একটাব মধ্যে দশ-বারো প্যাকেট বিদেশী সিগারেট, একটা স্কচের বোতল, গোটা দুয়েক পারফিউমের শিশি, একটা খামে এক গোছা নতুন কড়কড়ে টাকা, কত কে জানে!

এটা নিশ্চয়ই ঐ মিথিলা হারামজাদার কাজ!

উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি যে নীচে একটু দূরে পল্টু আর হারাধন নামে দুজন ক্লাশ ফোর দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পাহারা দিচ্ছে, যাতে আমি কেটে পড়তে না পারি!

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পল্টু একগাল হেসে বললো, আজ হেডঅফিস থেকে দুজন সাহেব আসছেন, স্যার। চেকিং হবে। এক্ষুনি এসে পডবেন, তাই এখানে দাঁডিয়ে আছি।

জানলার কাছ থেকে সরে এলুম সঙ্গে সঙ্গে। এগুলো আপাতত লুকোতেই হবে। কিন্তু কোথায় লুকোই? এই ঘরে একটা আলমারি পর্যন্ত নেই। শুধু টেবিল, দুখানা চেয়ার, আর একটা খোলা র‍্যাক। টেবিলটাও এমনই ন্যাড়া যে একটা ড্রয়ার পর্যন্ত নেই।

প্যাকেট দুটো নামিয়ে রাখলুম টেবিলের নীচে। কিন্তু এতে কোনো লাভ নেই। ঘরে ঢুকলেই এদিকে নজর পড়বে। চেয়ারের কাছে এনে পা দিয়ে চাপা দেবো? ধুতি থাকলে তবু ঢাকা যেত, কিন্তু প্যাণ্টে সুবিধে হবে না।

আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা টিনের, সেটা বেশ বড়। ওটাকে উল্টো করে প্যাকেটদুটোকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। ঘরের এক কোণে প্যাকেটদুটো টেনে নিয়ে বাস্কেটটা দিয়ে চাপা দিলুম, সেটা বেশ মাপে মাপে হয়ে গেল।

কিন্তু ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের এরকম বিসদৃশ আচরণ কি অফসররা বরদাস্ত করবে? আমি যদি কোথাও চেকিং করতে যেতুম, তা হলে এরকম অবস্থায় কী করতুম? প্রথমেই একটা লাথি মেরে এটাকে সোজা করবার চেষ্টা করতুম না?

আর কোনো উপায় আমার মনে আসছে না। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মাথার মধ্যে চিড়িক চিড়িক ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল। খুব জোর ব্যথা।

দু হাতে মাথাটা চেপে বসে রইলুম নিজের চেয়ারে। মাথাটা ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে টেবিলের দিকে। সুরঞ্জন দত্তরায়ও আসছেন চেকিং-এ? ওঁকে আমি কী কৈফিয়ত দেবো? চোর অপবাদ নিয়ে চাকরি খোয়াতে হবে! মা জানবেন, তাঁর ছেলে চোর। মেজমামার সম্মান নষ্ট হবে।

কিন্তু আমার আর কী করা উচিত ছিল? অন্য লোকদের চুরি করতে দিলেও ভিজিলেন্সের সহদেব পাল শাসিয়ে যাবে। আর চুরি আটকাতে গেলে স্টোরকিপার মিথিলা আমাকে জড়াবে। ওরা নিজেরা নিশ্চয়ই আজ ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে আছে!

সুরঞ্জনবাবুকে সব সত্যি কথা খুলে বললে উনি বুঝবেন না?

আমি অনেক সময়েই লক্ষ করেছি, সত্যি কথাটাই সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

দরজার দিকে কিছু একটা শব্দ হতেই আমার মূর্ছা যাবার মতন অবস্থা হলো। এসে গেছে, হেডঅফিসের বড়বাবুরা এসে গেছে এর মধ্যে?

কোনোরকম তাকিয়ে দেখি, দরজায় নয়, বাইরের বারান্দার দিকের জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে টোকা মারছে নীলা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার ব্যথা কমে গেল। আমি লাফিয়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে নীলার হাত ধরে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এতদিন আসোনি কেন?

নীলা বললো, আসবার খুব চেষ্টা করেছি। পারছিলুম না। পৌঁছতে পারছিলুম না।

আমি বললুম, আমি আর তোমাকে যেতে দেবো না।

নীলা হেসে বললো, যেতে দিও না। আমাকে ধরে রেখো।

আমার হাত ছাড়িয়ে নীলা ঘরের মধ্যে চলে এলো। চেকিং স্টাফদের যা করা উচিত, ঠিক সেটাই করলো নীলা। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তুলে নিয়ে বললো, এগুলো এখানে রেখেছো কেন? বাজে জিনিস!

নীলাও কি সত্যি কথাটা বুঝবে না?

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই নীলা নীচু হয়ে প্যাকেটদুটো তুলে নিয়ে বললো, এসো।

আবার সে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। একটা প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললো, নাও, খুব জোরে ছুঁড়ে দাও!

দুটো প্যাকেট ঝুপ ঝুপ করে গিয়ে পড়লো জলার মধ্যে। কচুরিপানায় যেটুকু ফাঁক হয়েছিল, তাও জুড়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আর কেউ ওগুলোর খোঁজ পাবে না।

এত সহজ সমাধান ছিল?

আসলে আমার মধ্যবিত্ত মন চুরি বা ঘুষ নিতে ভয় পায়। অথচ প্রাণে ধরে এসব দামি জিনিস ফেলে দেবার কথাও চিন্তা করতে পারে না। স্কচের বোতল, বিলিতি সিগারেট, খামের মধ্যে একগোছা টাকা, এগুলো এত অবহেলায় যে ফেলে দেওয়া যায়, তা জানতুমই না।

কী চমৎকার হালকা হয়ে গেল শরীরটা।

এক ঝাঁক বক এসে বসেছে জলার মাঝখানে। কচুরিপানায় সবুজের মধ্যে ধপধপে সাদা বকগুলিকে মনে হচ্ছে বড় বড় ফুলের মতন।

বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নীলা বললো, তুমি এমন গোমড়ামুখ করে বসেছিলে, আমার দেখে খুব মায়া লাগছিল।

আমি ওর মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কে বলো তো?

ঝলমলে হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে ও উত্তর দিল, আমি নীলা! তুমিই তো আমায় ঐ নামে ডেকেছো!

—তুমি আজও নীল শাড়ি পরে আছো। তোমার কি আর কোনো শাড়ি নেই?

—তুমি যদি চাও, আমি অন্য শাড়ি পরতে পারি। তবে নীলরঙটা আমার খুব পছন্দ।

—নীল রঙ আমিও ভালোবাসি। কিন্তু প্রত্যেকবার তোমাকে একইরকমভাবে দেখি, তুমি কোথা থেকে আসো?

ওপরের দিকে আঙুল তুলে দুষ্টুমির স্বরে নীলা বললো, ঐ আকাশ থেকে!

আাম নীলার একটি হাত টেনে নিলাম নিজের কাছে। কী মসৃণ, নরম হাত। ও কোনো চুড়ি পরে না, ঘড়িও পরে না। এরকম মেয়ে আকাশ থেকে নেমে আসে না।

আমি অনুনয় করে বললুম, সত্যি করে বলো, তুমি কোথায় থাকো?

—দিকশূন্যপুরে।

—যাঃ, সে তো অনেক দূরে। পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয়।

—আজকাল কাছাকাছিও দিকশূন্যপুর তৈরি হয়েছে। তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো।

—সত্যি নিয়ে যাবে? কবে নিয়ে যাবে?

—যেদিন তুমি চাইবে!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে, কেউ উঠে আসছে ওপরে।

আমি বললুম, নীলা, তুমি এই বারান্দায় থাকো। চলে যেও না।

আমি ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসতেই ঘরে এসে ঢুকলেন সুরঞ্জন দত্তরায় এবং অন্য একজন। এই গরমের মধ্যেও দুজনেই সুট পরে আছেন।

বড় অফিসার এলে উঠে দাঁড়াতে হয়। নমস্কার করতে হয়। সুরঞ্জন দত্তরায় এখন আমার মামার বন্ধু নন, আমার বস্।

তিনি তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ গ্যাডগিল, এই ছেলেটিকে এখানে নতুন পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, মোটামুটি ভালোই কাজ করছে।

অন্য লোকটি ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চেয়ারটায় আমি একবার বসতে পারি?

আমি উত্তর দেবার আগেই সুরঞ্জন দত্তরায় খুব খাতিরের সুরে বললেন, অবশ্যই! অবশ্যই!

বোঝা গেল, এই গ্যাডগিল সুরঞ্জন দত্তরায়ের ওপরের লোক। সম্ভবত ইনি এসেছেন বম্বে থেকে, যেখানে আসল হেড অফিস।

গ্যাডগিল আমার চেয়ারটায় বসে ঠোঁট চওড়া করে হেসে বললেন, জানো দত্তরায়, আমি জীবনে চাকরি শুরু করি এই পোস্টে। বম্বে গোডাউনের ওয়াচম্যান। তখন এই ছেলেটির চেয়েও বয়েস ছিল আমার কম।

সুরঞ্জন দত্তরায় হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, আপনি নিজের চেষ্টায় এত বড় হয়েছেন! সেলফ-মেড ম্যান! আজ আপনি একেবারে টপ পজিশনে।

এক ঝলকের জন্য একটা দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠলো। নিজের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে আসছেন সুরঞ্জন দত্তরায়, ভেলভেটের ড্রেসিং-গাউন পরা, দাঁতে কামড়ানো পাইপ, হাতে হুইস্কি ভর্তি গেলাস, মুখে একটা গর্বিত ভঙ্গি। সেই সুরঞ্জন দত্তরায়কেও অন্য একজনের সামনে কাঁধ ছোট করে, বেঁকে দাঁড়িয়ে, দেঁতো হাসি হেসে মোসাহেবি করতে হয়।

গ্যাডগিল বললেন, না, না, সেলফ-মেড ম্যানট্যান কিছু না! স্রেফ লাক।

শোনো ঘটনাটা। আমি ওয়াচম্যানের কাজ করি। একদিন কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভুলাভাই দেশাই এলেন ইন্সপেকশান করতে। আজ আমরা যেরকম এসেছি। আমার ঘরে এসেই মিঃ ভুলাভাই দেশাই অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমার মুখে তিনি কী দেখতে পেলেন কে জানে। তাঁর পাশে ছিল মিঃ দেশপাণ্ডে, তাকে তিনি বললেন, এই ছেলেটি, এই ছেলেটি এই সামান্য কাজ করে ? না, না, এটা ঠিক নয়। একে আরও ভালো কাজ দেওয়া উচিত !

স্বরঞ্জন দত্তরায় বললেন, আপনার মুখে তিনি প্রতিভার জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলেন ! ওঁর দেখবার চোখ ছিল !

গ্যাডগিল বললেন, প্রতিভা না ছাই ! তোমরা বাঙালীরাই প্রতিভা-ট্রতিভায় বিশ্বাস করো। ওষুধের কম্পানি চালাতে আবার প্রতিভা লাগে নাকি ? আসল ব্যাপারটা হয়েছিল, ভুলাভাই-এর একমাত্র মেয়ে তখন পলিটিক্সে জয়েন করে সদ্য সাতদিনের জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে। ওরকম ফ্যামিলির মেয়ের পক্ষে পলিটিক্স করা, বিশেষত জেল খাটা মহাপাপ, তাই না ? সেইজন্যই ভুলাভাই একটি গরিবের ছেলে খুঁজছিলেন, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরজামাই করতে পারবেন। আমাকেই ওঁর পছন্দ হয়ে গেল !

আমি পেয়ে গেলাম রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গে।

—এ যে স্যার গল্পের মতন !

—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান ! আজ আমি কম্পানির এম ডি, কিন্তু আমার সেই প্রথম জীবনের কাজের দিনগুলো আমি ভুলিনি ! এইরকম ঘরে এসে ঢুকলেই আমি নস্টালজিক হয়ে পড়ি !

আমার দিকে চোখ তুলে গ্যাডগিল আবার বললেন, ইয়াংম্যান, তোমার এ কাজ কেমন লাগে ? উপভোগ করো নিশ্চয়ই ?

স্বরঞ্জন দত্তরায় সামান্য রসিকতা করার চেষ্টায় বললেন, এই ছেলেটিও এখনো বিয়ে করেনি। ভালো ঘরের ছেলে, স্বভাব-টভাব ভালো, আপনি ইচ্ছে করলে আপনার মেয়ের সঙ্গে—

ঘর ফাটিয়ে হাসলেন গ্যাডগিল।

তারপর বললেন, দত্তরায়, ইতিহাস সবসময় নিজেকে রিপিট করে না। প্রথম কথা, আমার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা, আজকাল কেউ ঘর-জামাই রাখে না, আমার দুই মেয়েই থাকে ফরেনে। তৃতীয় কথা, এই ছেলেটি,

এর নাম তো নীললোহিত, এর চরিত্র সম্পর্কে আমি অলরেডি অভিযোগ পেয়েছি। আমার কাছে ওর নামে একটা অ্যানোনিমাস লেটার এসেছে!

আমি বারান্দার দিকে আড়চোখে তাকালুম। নীলা এককোণে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে সরল কৌতুকের হাসি।

গ্যাডগিল হাতের কাগজটা তুলে বললেন, এই সেই চিঠি। আজ সকালে আমার হোটেলে একজন এটা দিয়ে গেছে।

স্বরঞ্জন দত্তরায় পাংশু মুখে জিজ্ঞেস করলেন, ওর নামে কী অভিযোগ করেছে?

গ্যাডগিল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডোনট গেট অ্যালার্মড! বেনামী চিঠি আমি ঘৃণা করি। সব অফিসেই যারা ভালো কাজ করে, তাদের নামে বেনামী চিঠি যায় মালিকদের কাছে। তুমি যেমন কাজ করছো, চালিয়ে যাও! অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারটা কোথায় দেখি?

টেবিলের ওপরেই রয়েছে বড় খাতাটা। গ্যাডগিল সেটার পাতা উল্টে উল্টে খুব মনোযোগ দিয়ে সব কর্মচারীদের সইগুলো দেখতে লাগলেন। আপন মনে বলতে লাগলেন, বোকা লোকটা চিঠিটা টাইপ না করে হাতে লিখেছে। এই লোককে ধরে ফেলা কিছুই শক্ত নয়।

হঠাৎ মুখ তুলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সিগারেট খাও? দেখি, তোমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট দাও তো আমাকে!

স্বরঞ্জন দত্তরায় নিজের পকেট থেকে সিগারেট বার করে বললেন, এই যে, এই নিন!

গ্যাডগিল তবু হাত বাড়িয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমাকে আমারটা বার করতেই হলো।

গ্যাডগিল ভুরু তুলে বিরাট অবাক হবার ভাব দেখিয়ে বললেন, তুমি এতবড় একটা স্টোরে কাজ করো, অথচ তুমি বিলিতি সিগারেট খাও না? আশ্চর্য! আশ্চর্য!

স্বরঞ্জন দত্তরায় বললেন, আমারটা নিন। আমারটা খাঁটি বিদেশী। আমি কাস্টমস্ থেকে আনাই।

গ্যাডগিল বললেন, থ্যাংক ইউ! আই ডোনট স্মোক। আমি ওর প্যাকেটটাই শুধু দেখতে চেয়েছিলাম।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ তুলে মিথিলাবাবু, পল্টু আর ঝাঁকড়া-চুলো গোঁফওয়ালা দারোয়ানটি একসঙ্গে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

তাদের চোখে বেশ বিস্ময়। ওদের মধ্যে কে রেখেছিল প্যাকেট দুটো ? নাকি তিনজনই এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ? ওরা আমার চেয়ারে বসা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে প্রফুল্ল মুখে কথা বলতে দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছে মনে হলো।

দারোয়ানবেশী সহদেব পাল এক লম্বা স্যালিউট দিয়ে বললো, স্যার, সব কুছ রেডি হ্যায়।

গ্যাডগিল জিজ্ঞেস করলেন, আমার জন্য লাল কার্পেট পাতা হয়েছে নাকি ?

মিথিলা বললো, হ্যাঁ স্যার, কার্পেট মানে জুট কার্পেট, এটা আমরা নিজেরা চাঁদা করে কিনেছি।

গ্যাডগিল বললেন, সমস্ত নোংরা ঢেকে দিয়েছো তো কার্পেটের নীচে ? আর কঙ্কালগুলো লুকিয়ে রেখেছো কাবার্ডে ? বাঃ, বাঃ, চলো যাই !

উঠে দাঁড়িয়ে গ্যাডগিল আমাকে বললেন, আমার বিবাহযোগ্যা মেয়ে নেই। কিন্তু আমার দুটো হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে। আমার পরে যে আসবে, সে হয়তো তোমাকে অনেক বেশি সুযোগ দেবে। আপাতত দাঁতে দাঁত চেপে চালিয়ে যাও !

গ্যাডগিল আমার কাঁধ দুটো চাপড় মেরে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

সুরঞ্জন দত্তরায় ওদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েও একবার চট করে ফিরে এসে আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, শোনো নীলু, গ্যাডগিল কক্ষনো কারুর কাঁধে চাপড় মারে না। এটা একটা বিরল ঘটনা। তোমার চেয়ারে বসেছেন, তোমার সঙ্গে হেসে কথা বলেছেন। তোমার উন্নতি হলো বলে। গ্যাডগিলের আর মেয়ে নেই তো কী হয়েছে ! আমার তো আছে ! ঠিক আছে, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো।

ওরা সবাই নীচে নেমে যাবার পর আমি আবার চলে এলুম বারান্দায়।

নীলা বললো, আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম, আমায় কেউ দেখতে পায়নি।

আমি বললুম, তুমি সব শুনেছো ?

নীলা বললো, হ্যাঁ, সব, এমন, কি ফিসফিস করে কথাও এখান থেকে শোনা যায়। তোমার চাকরির উন্নতি হবে বললো।

—আমি চাই না ! চাকরির উন্নতি মানে এই ঘরটা ছেড়ে যাওয়া। এই ঘরটার জন্যই তো চাকরিটা আমার তবু পছন্দ হয়েছে।

—হয়তো এর চেয়েও ভালো ঘর দেবে।

—নীলা, তোমারই জন্য। তুমি বাক্সদুটো ফেলে দেবার বুদ্ধি দিলে ভাগ্যিস !

—ও কিছু না। নীললোহিত, আমি এবার চলে যাচ্ছি।

—না, না, এক্ষুনি যেও না।

—থাকতে পারছি না। ত্যাখো, আমার শরীর কাঁপছে।

—আমি তোমাকে ধরে রাখবো। যেতে দেবো না।

—ধরে রাখো আমাকে। শক্ত করে ধরো।

আমি দু হাত বাড়াতেই নীলা আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি এক হাত রাখলুম তার পিঠে, আর এক হাত কোমরে। তার বুক মিশে গেছে আমার বুকে, তার দুই উরু ঠেকেছে আমার উরুতে। আঃ কী আনন্দ! কী আকস্মিক প্রাপ্তি!

আমি তার উন্মুখ ঠোঁটে একটা আঙুল বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলুম, এবার সত্যি করে বলো তো, তুমি কে? তুমি কি আমার স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম, না আমার যাবৎজীবনের পুণ্যফল?

নীলা ব্যাকুল গলায়.বললো, তোমার মনটা তরল হয়ে গেছে, নীললোহিত। আমি আর থাকতে পারছি না। আমাকে তুমি পরিপূর্ণ করো। আমাকে চলে যেতে দিও না। আমি যেতে চাই না।





সারারাত ঘুম এলো না কিছুতেই।

শুধু চোখের সামনে নীলাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ রক্ত-মাংসের জীবন্ত নীলা নয়, আমার ঘরে সে কখনো আসেনি। অন্ধকারের মধ্যে ভেসে উঠেছে তার ছবি, সে হাসছে, কথা বলছে, মিলিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ।

কে ঐ নীল শাড়ি পরা মেয়েটি? যখন সে সত্যি সত্যি আসে, তাকে স্পর্শ করি, তখন বেশি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে না, মনে হয়, তার উপস্থিতি খুব স্বাভাবিক, সে শুধু আমারই জন্য আসে। তাকে অন্য লোকরাও দেখতে পায়, একবালপুরের গুণ্ডাদুটো বলেছিল, মেয়েটা কোথায় গেল?

মাথার মধ্যে যখন চিড়িক চিড়িক ব্যথাটা বেশ বেড়ে যায়, তখনই নীলা আসে। কিন্তু এই ব্যথাটা কখন কোথায় শুরু হবে, তার ঠিক নেই। ব্যথাটা আমি সৃষ্টি করতে পারি না। তাই ইচ্ছেমতন যে-কোনো সময় তাকে ডাকা যায় না।

নীলা বার বার বলে, আমাকে যেতে দিও না, আমাকে পরিপূর্ণ করো! এর মানে বুঝতে পারি না। আমিই কি তাকে নির্মাণ করছি? তাকে পুরোপুরি নির্মাণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি একটু উচ্ছল হয়ে উঠলেই ও আর থাকতে পারে না।

কতখানি তীব্র একাগ্রতায় এমন একজন নারীকে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখা যায়?

দুদিন ধরে আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।

নীলার মতন একটি মেয়ে আমার কাছে স্বেচ্ছায় আসে, আমার দুঃখের সে ভাগ নিতে চায়, অপমানের সময় সে সান্ত্বনা দেয়, এরকম সৌভাগ্য কজনের হয়? আবার সে কোথায় থাকে তা জানি না, ইচ্ছে করলেও আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি না, এও যে চরম কষ্টকর!

নীলা যে বললো, সে দিকশূন্যপুরে থাকে, কাছাকাছি দিকশূন্যপুর তৈরি হয়েছে, তা কি ইয়ার্কি? আমি অনেকদিন দিকশূন্যপুরে যাইনি। সে জায়গাটার জন্য আমার মন কেমন করে!

জানালার বাইরে একটা চিলের ডাক শোনা গেল। প্রত্যেকদিন ঐ চিলটার ডাকে আমার ভোর সূচিত হয়, ছাদের কার্নিসে এসে বসে।

এখন আর ঘুমোবার চেষ্টা করারও কোনো মানে হয় না।

রাস্তায় খবরের কাগজের হকাররা সাইকেলের বেল বাজিয়ে ছুটছে। ঠিকে-ঝি দরজায় ধাক্কা দিতে আমিই গিয়ে খুলে দিলুম।

মা কিংবা দাদা-বৌদি এখনো জাগেনি। ভোরের নরম আলো গায়ে মাখবার জন্য আমি দাঁড়ালুম গিয়ে বারান্দায়। হাফপ্যাণ্ট আর কেডস পরে অনেক প্রৌঢ় মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছে, কোমরের বেড় কমাবার জন্য কেউ কেউ ছুটছে।

এ দৃশ্য আমার ভালো লাগে না। ছাদটা বরং আকর্ষণীয়। মা অনেকগুলো ফুলগাছের টব বসিয়েছেন। টবের গাছ আমার তেমন পছন্দ নয়, কিন্তু মধুর অভাবে গুড়। গাছের পাতায় যে ভোরের শিশির লেগে থাকে, সেগুলো আঙুলে তুলে ঠোঁটে লাগালে বেশ একটা প্রকৃতিকে চুমু খাওয়ার স্বাদ পাওয়া যায়। অবশ্য শিশির পড়ে শীতকালে। এখন পাতাগুলো ভেজেনি।

ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। এখানে আমি সম্পূর্ণ একা। এখন নীলা আসতে পারে না? সেই এক বৃষ্টির রাতে যেমন এসেছিল?

আমি গুনগুন করে বলতে লাগলুম, নীলা, এসো, নীলা, এসো…।

ফুরফুরে হাওয়ায় এত আরাম লাগছে, মাথার মধ্যে একটু ও ব্যথা নেই!

আমি সারা ছাদ ঘুরে ঘুরে ডাকতে লাগলুম নীলা, এসো, নীলা, একবার এসো, একটুক্ষণের জন্য।

কোনো সাড়া নেই। কোথায় নীলা? কোনো পাত্তা নেই।

রোদ্দুর চড়া হবার পর নেমে এলুম ছাদ থেকে।

চা তৈরি হয়ে গেছে। আমার দিকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে বৌদি জিজ্ঞেস করলো, তুমি বুঝি ছাদে গান গাইতে যাও?

আমি বললুম, না, ধ্যান করি।

বৌদি এমন একটা চোখের ভঙ্গি করলো, যেন এরকম অসম্ভব কথা সে কখনো শোনেনি! অথচ আমি খাঁটি সত্যি কথাই বলেছি, সত্যের কি হেনস্থা!

বৌদি আবার জিজ্ঞেস করলো, আজ তো তোমার ছুটি। তোমার দাদা বলছিল, আজ তুমি বাজার করে আনবে, না ও যাবে?

আমাকে এখন সকাল আটটার মধ্যে অফিসে বেরুতে হয় বলে বাজার করার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। বাড়ির অন্যান্য কাজের জন্যও এখন আর যখন

তখন কেউ আমাকে হুকুম করে না। ঠিকে-ঝির মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সে সকালের দুধ নিয়ে আসে। কেরোসিন কিংবা চিনি সে যোগাড করে। বাড়ির চাকরগিরি করার বদলে আমি এখন এক ওষুধ কম্পানির চাকর হয়েছি, তাই বাড়িতে খাতির বেড়ে গেছে। যদিও এখনো এক মাসের মাইনেও পাইনি, তবু সেই সম্ভাবনাতেই বৌদি টাকা ধার দেয়।

দাদা একদিন জিজ্ঞেস করছিল, হ্যাঁরে নীলু, তোরা অফিস থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ পাস না ? তোদের কম্পানি ভালো আয়রন টনিক বানায়। আমার পেটের গোলমালটা কিছুতে যাচ্ছে না, মাসে তিরিশ-পঁয়তিরিশ টাকার ওষুধ কিনতে হয় !

আমি বলেছিলুম, না, কারুকে কিছু নিতে দেয় না।

দাদা বলেছিল, কমিশনে তো অন্তত পেতে পাবিস ? খোঁজ নিয়ে ছাখ, নিশ্চয়ই অনেকেই নেয়।

বৌদি বলেছিল, নীলু মুখ ফুটে কারুকে কিছু বলতেই পারবে না। ও যা মুখচোরা !

পঁয়তিরিশ টাকার ওষুধের কত কমিশন হতে পাবে ? আমি যদি বলতুম, এক-গোছা টাকা আমি খামসুদ্ধ জলে ফেলে দিয়েছি, তা হলে দাদা-বৌদির মুখের চেহারা কীরকম হতো ?

অফিসের পার্টিতে দাদা ড্রিংক করে, মাঝেমধ্যে বাডিতেও হুইস্কির বোতল কিনে আনে। শস্তা বোতলের দামও আশি-নব্বই টাকা। বিনা পয়সায় স্কচ পাবার সম্ভাবনা দেখলে কি দাদা ছাড়তো ?

দাদা নিউজ এজেন্সিতে কাজ করে। সে অফিসে ঘুষ পাবাব কোনোরকম সুযোগই নেই। দাদা তাই ঘুষের বিরুদ্ধে প্রায়ই বক্তৃতা দেয়।

অনেকটা দয়া করার ভঙ্গিতে বৌদিকে বললুম, ঠিক আছে, দাও আমিই আজ বাজার করে দিচ্ছি !

মায়ের জন্য নিমপাতা আর চালতা, বৌদির জন্য মোচা, আর দাদার জন্য চিংড়িমাছের মুড়ো, এই তিনটে জিনিস আনতেই হবে। আমাদের মতন পরিবারে গলদা চিংড়ি খাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, তবে শুধু মুড়ো এক একদিন বেশ শস্তায় পাওয়া যায়। মাছগুলো চলে যায় সাহেবদের দেশে। ভাগ্যিস বোকা সাহেবগুলো এখনো গলদা চিংড়ির মুড়োভাজা খেতে শেখেনি !

বাজার করতে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু আজ কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না। কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি, তবু বাজারের মধ্যে জল প্যাচপ্যাচ করছে, মাছের

বাজারটার মুখে নোংরা জলের মধ্যে মধ্যে ইট পেতে রেখেছে। কেউ কোনো আপত্তি বা প্রতিবাদ করে না। একটা লোক আমাকে ধাক্কা দিতেই নোংরার মধ্যে পা পড়ে গেল!

লোকটা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল টপ করে। সুযোগও দিল না প্রতিশোধ নেবার। শুধু চটি না, প্যাণ্টেও কাদা লেগেছে।

সব কিছুর আজ আগুন দাম। ট্যাংরা মাছ ষাট টাকা, কুচো চিংড়ি পঁয়তিরিশ। পার্শে মাছ পঞ্চাশ, গলদার মুড়ো আসেনি। এইসব দিনে অ্যামেরিকান পোনা ছাড়া গতি নেই, যদিও দাদা এই পেটমোটা মাছ দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

ছুটির দিনে বাজারের বাজেট পঁচিশ, অন্যদিন কুড়ি। এখনো বলতে গেলে একা দাদার উপার্জনেই সংসার চলছে, বৌদির মাইনে সামান্য। এর বেশি খরচ করার উপায় নেই। কিন্তু এই টাকাতে কিছুই প্রায় কেনা যায় না। মাত্র কয়েক বছর আগে বাবা দশ টাকাতে কত কী কিনে আনতেন!

ছোট সাইজের অ্যামেরিকান পোনা কুড়ি টাকা কিলো, একটার ওজন হলো পাঁচশো। মাছটা থলিতে নেবার পর আমি মাছওয়ালার দিকে কুড়ি টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলুম।

সে লোকটা একটা চটের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে, কী ভেবে আবার বার করে আনলো। সেটা চোখের সামনে তুলে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বললো, দাদা, এটা তো চলবে না! এটা জাল!

আমি চমকে গিয়ে বললুম, জাল?

মাছওয়ালা বললো, এই দেখুন না। জলছাপ নেই। মাঝখানটায় জোড়া।

নোটটা নিজের হাতে নিয়ে দেখলুম, সত্যিই সেটাতে জলছাপ নেই, মাঝখানটায় আঠা দিয়ে জোড়া হয়েছে। একটা অতি বাজে ধরনের জালি নোট।

আমি বললুম, যাঃ!

ঐ যাঃ বলাটাই আমার কাল হলো। আমার কাছে আর মাত্র পাঁচ টাকা আছে, বাজার করা হবে না, আবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এইসব দ্রুত চিন্তায় আমার মুখ দিয়ে ঐ অসাবধান উক্তি বেরিয়ে এলো।

কেননা পরের মুহূর্তেই বুঝলুম, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই নোটটা আমি দিইনি। আমার টাকাটা ছিল অপেক্ষাকৃত নতুন, সেটা দু ভাঁজ ছিল, এটা চার ভাঁজ। সব টাকাই এক এক টুকরো কাগজ, তবু হাতে নিলে দুটো নোটের তফাৎ বোঝা যায়।

মাছওয়ালা বললো, কেউ আপনাকে গছিয়ে দিয়েছে! একদম দু'নম্বরি!

আমি বললুম, এটা তো আমাব নোট নয়। আমি এটা দিইনি ভাই তোমাকে।

—বাঃ, এই মাত্তর দিলেন!

—না, না, অন্য নোট দিয়েছি। তুমি তোমার ওখানটায় দ্যাখো।

—এই দেখুন, আমার এখানে আর কুড়ি টাকার নোটই নেই। আমি দেখে শুনে এইরকম নোট নোবো? আর একখানা দিন।

—আর একখানা নেই আমার কাছে। আমি বলছি, আমি ভালো নোট দিয়েছি!

সে লোকটি পাশের এক মাছউলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি দ্যাখোনি, এই বাবু একটা কুড়ি টাকার নোট দিলেন! আমার কাছে এই এক-খানাই মাত্তর কুড়ি টাকা। অথচ উনি বলছেন, উনি দ্যাননি!

মাছউলি ভালোমানুষের মতন মুখ করে বললো, হ্যাঁ, দেখলাম তো!

আমি এবাব ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলুম, দেখবে মানে, কী দেখবে? আমি একটা নতুন কুড়ি টাকার নোট দিয়েছি!

—না, আপনি দ্যান নি।

—হ্যাঁ দিয়েছি।

অন্য পাশ থেকে আর একজন মাছওয়ালা নোটটি দেখে আমার দিকে আবার বাড়িয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, এ কী চালাতে এসেছেন, দাদা? এই ভূষিমাল কখনো চলে?

রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। এরা আমাকে ভেবেছেটা কি? আমি গোছা গোছা পঞ্চাশ টাকার নোট কচুরিপানা ভর্তিজলে ফেলে দিয়েছি, সেই আমাকে মাত্র কুড়ি টাকার জন্য অবিশ্বাস? পৃথিবীটা কী হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

মাছওয়ালা হাত বাড়িয়ে আমার থলে থেকে মাছটা তুলে নেবার চেষ্টা করতেই আমি গর্জন করে বললুম, খবর্দার, হাত দেবে না!

লোকটি গলা তুলে বললো, আপনাকে মিনিমাগনায় মাছ দেবো নাকি?

চ্যাচামেচিতে খানিক ভিড় জমে গেছে। কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়তে রাজি নই। কেউ একজন বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, ভ্যাজাল নোট চালাতে গেলে জেল হয়ে যায়!

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকে কিছু বলতে যেতেই দেখি পাশে দাঁড়িয়ে আছে নীলা!

আমার সমস্ত রাগ উবে গেল এক মুহূর্তে। আমি স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার মাথায় তো কোনো যন্ত্রণা হয়নি, তবু নীলা এসেছে?

নীলা মৃদু গলায় বললো, চলো।

আমি কাতরভাবে বললুম, ছাখো, এরা আমাকে ঠকাচ্ছে!

মাছওয়ালা নীলাকে বললো, দেখুন তো দিদি, আমার কী দোষ! উনি কোথা থেকে একটা জালি টাকা নিয়ে এসেছেন!

নীলা বললো, ঠিক আছে। কোনো একজনের ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। আপনার কিংবা ওর।

আমি বললুম, আমাব ভুল হয়নি।

নীলা আমার বাহু ছুঁয়ে বললো, মাছ কিনতে হবে না, চলো।

আমি থলি উপুড় করে ঢেলে দিলুম মাছটা। নোটটা ছুঁড়ে দিলুম লোকটার দিকে। তারপর নীলার সঙ্গে বেরিয়ে এলুম সেই ভিড় থেকে।

নীলা সলজ্জ ভর্ৎসনার স্বরে বললো, তুমি বাজারের লোকজনদের সঙ্গে মারা-মারি করতে যাচ্ছিলে, নীললোহিত? এ কি তোমাকে মানায়?

সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে নিয়ে আমি বললুম, না, আমার ভুল হয়েছে। ওদের সঙ্গে তর্কে আমি পারতুম না। কিন্তু আমাকে এমনভাবে ঠকাবে কেন? বলো?

নীলা বললো, ওকে নিশ্চয়ই অন্য কেউ ঠকিয়েছে।

—তুমি কী করে ওই বাজারের ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজে পেলে, নীলা?

—আমার তবু একটু দেরি হয়ে গেল। আমি সকাল থেকেই তোমার কাছে আসতে চাইছিলুম।

—তোমার কাছে টাকা আছে, নীলা? আমাকে ধার দেবে? আমার কাছে মাছ কেনার আর টাকা নেই। পকেটে আর মোটে পাঁচ টাকা।

—আমার কাছেও টাকা নেই। তোমার পাঁচ টাকায় কিছু পাওয়া যাবে না।

—হ্যাঁ, নিমপাতা, চালতা, মোচা কোনোরকমে হয়ে যেতে পারে। আলু-পেঁয়াজের দোকান আমার চেনা, ওখানে ধারে পেতে পারি। নিরামিষ বাজার হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে বাজারে ঘুরবে? তোমার কষ্ট হবে। এই নোংরা, জল-কাদার মধ্যে!

—যাঃ, কষ্ট আবার কিসের ? অন্য মেয়েরা বুঝি বাজারে আসে না ? ঐ তো, আরও দু'একজনকে দেখছি !

—কিন্তু তুমি যে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা।

—কিচ্ছু আলাদা নই। চলো, তুমি কী রকম বাজার করো, দেখবো। তুমি দরদাম করতে পারো ?

—নিমপাতা আর চালতা মোচা কেনার জন্য দরদাম লাগে না।

বাজারের অনেক লোক ঘুরে ঘুরে নীলাকে দেখছে। কেউ নীলাব গায়ে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করলে আমি তাকে হাত দিয়ে ঘিরে রাখছি। প্রায় সর্বক্ষণই নীলার শরীরের সামান্য ছোঁয়া লাগছে আমার শরীরে।

মোচা কেনার সময় আমি একটা ফুল ছিঁড়ে তার গোড়াটা দাঁতে কাটতেই নীলা জিজ্ঞেস করলো, ও কি করছো ? কাঁচা খাচ্ছো ?

আমি বললুম, তুমি জানো না বুঝি ? কোনো কোনো মোচা তেতো হয়। সেইজন্য খেয়ে দেখতে হয়।

নীলা বললো, দেখি দেখি ! আমিও একটু খেয়ে দেখি !

মোচাওয়ালি মেয়েটি বললো, দেখুন দিদি, আপনিও দেখুন। আমি তেতো মোচা বেচি না।

মাছওয়ালা, মোচাওয়ালি এরা সবাই নীলার সঙ্গে কথা বলছে। নীলা অলীক নয়। এই উপলব্ধি একটা অদ্ভুত আনন্দে যেন আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

আলুওয়ালা ধার দিতে রাজি হয়ে গেল এক কথায়। এক কিলো আলু সে ওজন করে দিচ্ছে, তার থেকে একটা আমি তুলে নিয়ে বদলে দিলুম।

নীলা জিজ্ঞেস করলো, ঐ একটা আলু তুমি শুধু সরিয়ে দিলে কেন ?

আমি বললুম, ঐ আলুটার গা খানিকটা নীল রঙের। মেয়েদের নীল রঙের শাড়িতে মানায়। কিন্তু নীল রঙের আলু ভালো হয় না। যারা ধারে কেনে, আলুওয়ালা তাদের নীল রঙের আলু দেয়।

আলুওয়ালাটি হেসে বললো, না, না। আমি দেখতে পাইনি।

আমি বললুম, পেঁয়াজও ধারে দিতে হবে। কিন্তু থ্যাৎলানো পেঁয়াজ তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে চলবে না।

নীলা খুব মজা পাচ্ছে। সে তার চম্পকবর্ণ হাতটি মুখে চাপা দিয়ে হাসছে নিঃশব্দে।

নিমপাতা কেনার পর আর মোটে দশটি পয়সা বাকি রইলো। আর একটা দরকারি জিনিস বাদ পড়ে গেছে। কাঁচা লঙ্কা।

বাজারের বাইরের রাস্তায় এক বুড়িকে বললুম, ওগো, দশ পয়সার কাঁচা লঙ্কা দাও তো ?

বুড়ি মুখঝামটা দিয়ে বললো, দশ পয়সায় হবে না! কাঁচালঙ্কার এখন অনেক দাম!

কাঁচালঙ্কার এখন যে কত দাম, তা কি আমি জানি না! মাত্র একশো গ্রামের দাম এক টাকা। কিন্তু আমার কাছে যে দশ পয়সার বেশি আর নেই।

আমি বললুম, দাও না যে কটা হয়!

পয়সাটা তার কোলের ওপর ফেলে দিতে সে আর আপত্তি করতে পারলো না। এই বুড়ির যৌবনে দশ পয়সার কত মূল্য ছিল, তা ভুলে যায়নি নিশ্চয়ই। গজগজ করতে করতে বললো, জিনিসপত্রের দাম এত বাড়ছে, সে কি আমাদের দোষ ?

গোটা সাতেক লঙ্কা তুলে দিল সে। তাও খুব কৃপার সঙ্গে।

কয়েক পা হেঁটে যাবার পর আমি নীলাকে জিজ্ঞেস করলুম, বাজারে এত লোক থাকতে ঐ মাছওয়ালাটা আমাকেই ঠকাবার জন্য বেছে নিল কেন ?

নীলা বললো, তুমি কুড়ি টাকার শোক ভুলতে পারোনি ?

আমি বললুম, শুধু টাকার জন্য নয়। লোকটা আমাকে মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিল। ও আমাকে···

হঠাৎ থেমে গিয়ে আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলুম। এতক্ষণ অন্য দিকটা আমি খেয়াল করিনি। মাছওয়ালাটি আজ আমার দারুণ উপকার করেছে।

আমি বললুম, না, না, না, ও ঠিক করেছে। ভাগ্যিস জাল টাকাটা চালাবার জন্য আমাকেই বেছে নিয়েছিল! ও ওরকমভাবে অপমান না করলে তুমি বাজারে আসতে না, নীলা!

নীলা বললো, আমি ওর কথা শুনিনি। তুমি আমাকে ডাকছিলে···

এও আর একটা বিস্ময়। ভোরবেলা ছাদে ঘুরতে ঘুরতে কতবার আকুলভাবে ডেকেছি, তবু নীলা আসেনি। বাজারে আমি নীলাকে ডাকবো কেন ? তার কথা তখন মনেও পড়েনি। অথচ নীলা আমার ডাক শুনতে পেয়েছে বলছে। গভীর-ভাবে ডাকারও একটা রহস্য আছে। আমি কখন ডাকি, আমি নিজেই তা জানি না।

আমি ওর হাত ছুঁয়ে বললুম, সেদিন তুমি আকাশ দেখিয়েছিলে। তুমি কি সত্যিই মহাকাশ থেকে আসো ?

মুচকি হেসে নীলা বললো, হতেও পারে ! নাও হতে পারে।

—তুমি কি কল্প-বিজ্ঞানের নায়িকা ? কিন্তু তাদের তো পাহাড়ের উপত্যকায় কিংবা খুব নির্জন কোনো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। বাজারের ভিড়ে, এরকম নোংরা জল-কাদার মধ্যে তো তাদের দেখা পাওয়ার কথা কখনো শোনা যায়নি !

—আমাকে বিশ্বাস করো, নীললোহিত, আমি যখন তোমার কাছে আসি, তখন পেছনের কোনো কথাই আমার মনে পড়ে না। তখন আমি শুধু তোমাকেই চিনি। অন্য কোনো প্রশ্নও আমার মনে জাগে না।

—ঠিক বলেছো। আমিও প্রশ্ন করতে চাই না। তুমি যে আসো, দেখা দাও, সেটাই তো দারুণ ব্যাপার। আমার মহাভাগ্য। তুমি এলেই আমার মনটা আতর জলে ধোওয়া হয়ে যায়। তুমি আছো, এটাই যথেষ্ট। 'তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ' ! তবু মানুষ তো সব সময় যুক্তি খোঁজে। তাই আমিও জানতে চাই, তুমি আমার কাছেই আসো কেন ? আমি তো সেরকম কেউ না। কোনো-দিক থেকেই আমার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আমার মতন কত ছেলে এই শহরে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তোমাকে পাবার মতন আমার যে কোনো যোগ্যতাই নেই, নীলা ! দেখছো না, আমি কত ব্যাপারে হেরে যাই ! আমাকে লোকে ভয় দেখায়, ঠকায়, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে পারি না। আমি সব সময় পালাবার সুযোগ খুঁজি। তোমার মতন মেয়েকে সাধারণত সার্থক পুরুষরাই পায়।

—আমি তো আর কোনো সার্থক পুরুষকে চিনি না, নীললোহিত।

—এই কলকাতা শহরের এত পুরুষমানুষের মধ্যে তুমি আর কারুকেই চেনো না ?

—না, এখনো চিনি না। চেনা উচিত বুঝি ?

—না, না, সে কথা বলছি না। তুমি শুধু আমাকে চেনো। এজন্য গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে। আমার হুর-রে বলে চিৎকার করা উচিত। এই রাস্তার মধ্যে আমার নাচতে, ডিগবাজি খেতে ইচ্ছে করছে !

—নীললোহিত, এবার আমাকে চলে যেতে হবে। আমার শরীর কাঁপছে।

—না, এখন যেও না। এত তাড়াতাড়ি···তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা

আছে। যেও না!

—এই ছাখো, আমার শরীরটা কাচের মতন হয়ে যাচ্ছে!

সত্যিই তো তাই। নীলার হাত দুখানা কাচের মতন স্বচ্ছ হয়ে আসছে। তার মুখখানা প্রিজ্‌ম-এর মতন, রোদ্দুর পড়ে এমন ঝলসাচ্ছে যে তাকানো যাচ্ছে না!

আমি বাজারের থলেটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সেই প্রকাশ্য রাস্তায় তার কাঁধ চেপে ধরে বললুম, তোমাকে এখন আমি কিছুতেই যেতে দেবো না!

নীলা ফিসফিস করে বললো, যেতে দিও না, আমাকে জোর করে ধরে রাখো!

আমি বললুম, তোমার কাচের মতন শরীর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে না তো?

নীলা বললো, আমাকে তোমার বুকের মধ্যে মিশিয়ে নাও।

একটা গাড়ি আমাদের পেছনে এসে হর্ন দিচ্ছে। আমি বললুম, সরবো না, কিছুতেই সরবো না। ছেড়ে দিলেই নীলা এখান থেকে চলে যাবে।

নীলা বললো, এই ছাখো, হাতদুটো আবার ঠিক হয়ে গেছে। চলো, ফুটপাথে উঠি।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। এখন রাস্তা-ভর্তি মানুষ। অনেকে অবাক হয়ে দেখছে আমাদের। কিন্তু নাগরিক সভ্যতায় কেউ কোনো মন্তব্য করে না।

ট্রাম রাস্তার কাছে এসে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে আমি বললুম, নীলা, তুমি কাচের মতন স্বচ্ছ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছিলে, তখন আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, সে কষ্ট কারুকে বোঝাতে পারবো না।

নীলা বললো, ঠিক আমারো অতখানিই কষ্ট হয়।

—তুমি সেদিন দিকশূন্যপুরের কথা বলছিলে! দিকশূন্যপুরের কথা তুমি কী করে জানলে? খুব কম লোকেই সে জায়গাটা চেনে।

—আমি তো দিকশূন্যপুরেই ফিরে যাই।

—তুমি বললে, এখন কাছাকাছি দিকশূন্যপুর তৈরি হয়েছে! এটা আমারও জানা ছিল না।

—তুমি যাবে সেখানে, নীললোহিত?

—বাঃ যাবো না? তুমি আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলে। আজই চলো।

—ঠিক আছে, তুমি বাজারের থলেটা রেখে এসো।

—তুমি এর মধ্যে আবার হারিয়ে যাবে না তো? নীলা, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি পর্যন্ত এসো। আমি এক দৌড়ে ওপরে রেখে আসবো।

কলকাতা শহরের ছেলেমেয়েরা হাত-ধরাধরি করে যায় না। কিন্তু গেলেই

বা ক্ষতি কি? আমি নীলার হাত ধরে হাঁটতে লাগলুম।

নীলাকে ওপরেও নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তা হলে অনেক নীরব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমার একজন বান্ধবী এলে মা কিংবা বৌদি ভুরু তুলবে না, কিন্তু নীরব প্রশ্নগুলো গায়ে বিঁধবে ঠিকই। তাতে নীলা যদি আবার কাচের শরীর হয়ে যায়!

বাড়ির সামনে এসে বললুম, তুমি এখানে একটু দাঁড়াবে? দু মিনিট!

নীলা ঘাড় হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ।

আমি নীলার একটা হাত তুলে নিয়ে কড়ে আঙুলের ডগাটা সামান্য কামড়ে দিলুম।

নীলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটার মানে কি?

আমি বললুম, তোমাকে একটা গণ্ডি দিয়ে রেখে যাচ্ছি। কেউ তোমার ওপর নজর দিতে পারবে না।

দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এলুম ওপরে। দরজাটা হাট করে খোলা। একটা ধপধপে সাদা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে।

বৌদিদের ঘরের দরজা বন্ধ। সেখান থেকে বৌদি জিজ্ঞেস করলো, কে, নীলু? ছাখো, কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! একটা কুকুর ঢুকে পড়েছে!

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এত সুন্দর একটা স্পিৎজ, এটা দেখে ভয় পাচ্ছ! এ কুকুর কামড়ায় না। এটা কোত্থেকে এলো?

বৌদি বললো, জানি না। তুমি ওটাকে তাড়িয়ে দাও প্লিজ। না হলে আমি ঘর থেকে বেরুতে পারবো না। সদর দরজা খোলা রেখে গেছে, অমনি এই কুকুরটা ঢুকে পড়েছে!

—দাদা কোথায়?

—তোমার দাদা এইমাত্র বেরুলো। মা বাথরুমে। আমাকে একা পেয়ে কুকুরটা কামড়ে দিতে এসেছিল।

—বৌদি, তুমি আর লোক হাসিও না। এইটুকু কুকুরকেও কেউ ভয় পায়! ওরা কামড়ায় না, আদর খেতে ভালোবাসে।

—তুমি ওকে বার করে দরজা বন্ধ করে দাও আগে।

কুকুরটা আমার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে লেজ নাড়ছে।

আমি নীচু হয়ে ওটাকে ধরতে যেতেই ও ভুক ভুক করে দুবার ডেকে দৌড়ে ঢুকে গেল আমার শোবার ঘরে।

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু কুকুরটা না তাড়ালে সত্যিই বৌদি বেরুতে পারবে না। দোতলায় ভাড়াটেরা কুকুর পুষছে নাকি ?

আমি আয়, আয়, আয় বলে একটু একটু করে এগোতে লাগলুম ওটার দিকে, সে-টাও একটু একটু করে পিছিয়ে ঢুকে গেল খাটের তলায়। যত ডাকি, কিছুতেই আসে না। এইটুকু কুকুরের তেজ আছে, এক একবার দাঁত বার করে ভয় দেখাতে আসে!

খাটের তলা থেকে কুকুর বার করা সোজা কথা নয়। অন্য ঘর থেকে বৌদি চ্যাঁচাচ্ছে, গ্যাছে ? গ্যাছে ?

আমি বললুম, দাঁড়াও, বার করছি, আর একটা লাঠি যদি পাওয়া যেত!

আজকাল কেউ বাড়িতে লাঠি রাখে না। হাতপাখাও থাকে না। খবরের কাগজ পাকিয়ে ভয় দেখাই, সেটা তবু এক কোণ থেকে অন্য কোণে সরে যায়। এ তো মহা মুশকিল দেখছি!

এবার কুকুরটার ওপর দারুণ রাগ হচ্ছে। ওকে আর মোটেই সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না। কিছু জিনিস দিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে স্পিৎজ কুকুরও রেগে যায়। দাঁত আছে, মরীয়া হয়ে কামড়ে দেওয়া আশ্চর্য কিছু না।

পুরো খাটটাকেই টেনে সরিয়ে আনলুম। এবার আর কুকুরটার কোনো দেয়ালের দিকে গা দেওয়ার উপায় রইলো না। উল্টো দিকে গিয়ে তাড়া দিতেই সে এবার ছুটে বেরিয়ে ঢুকলো মায়ের ঘরে।

মায়ের চৌকিটা নীচু। সেটার তলায় সে ঢুকতে পারলো না বটে, চতুর্দিকে কয়েক পাক ঘুরে সে একটা বিশ্রী কাণ্ড করলো। ঘরের এককোণে মায়ের ছোট-খাটো ঠাকুর দেবতার জায়গা, কয়েকটা ছবি ও একটা পেতলের সিংহাসন রয়েছে। কুকুরটা লণ্ডভণ্ড করে দিল সেই জায়গাটা।

এবার আমি তাকে খবরের কাগজ দিয়ে খুব পেটালুম, সে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে। কিন্তু মায়ের ঠাকুরের ছবিটবিতে কুকুর পা দিয়েছে, এটা মাকে জানানো উচিত নয়। দ্রুতহাতে গুছিয়ে দিতে লাগলুম সেগুলো। একটা কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল উল্টে পড়ে গেছে, সে আর কিছু করা যাবে না।

সব কোনোরকমে সামলে বৌদিকে বললুম, এবার ঠিক আছে। বেরিয়ে সদর বন্ধ করে যাও। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।

হুড়হুড় করে বন্যার জলের মতন সিঁড়ি দিয়ে প্রায় গড়িয়ে নেমে এলাম নীচে। দরজা থেকে এক লাফে রাস্তায়।

নীলা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটা শূন্য। নীলা নেই।



খুনীরা নাকি অকুস্থলে একবার না একবার ঠিক ফিরে যায়। নির্যাতিতারাও কি যায় না? একবালপুর-খিদিরপুরের মাঝামাঝি একটা নির্জন জায়গায়, পুকুর-ধারে দুটি সাইকেল আরোহী গুণ্ডা আমাকে মেরেছিল। সেখানেই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম সন্ধেবেলা। এবার আর পথ ভুল করে নয়, পথ চিনে।

আমার কাছে আজ ঘড়ি নেই, একশো টাকা নেই, কিছুই নেই। গুণ্ডারা আমার কী করবে? ওদের কথা আমি চিন্তাও করছি না। মনটা খারাপ হয়ে আছে নানা কারণে।

মানুষ মানুষকে কেন এত ভুল বোঝে?

বিকেলে হঠাৎ দীনেন বসুর যমজ বাচ্চাদুটোর কথা মনে পড়ছিল বার বার। কেন মনে পড়ছিল কে জানে! মনের ওপর তো শাসন চলে না!

দুটি ফুটফুটে যমজ শিশু, এক বছর কয়েক মাস মাত্র বয়েস, এখন বাবা-মায়ের কাছ থেকে কত আদর পাবার কথা। কিন্তু বাবাটি সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে, মা যখন তখন কাঁদে। বাবাটি স্ত্রী-পুত্রদের ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সামান্য একটা চাকরিকে উপলক্ষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বিষিয়ে গেছে।

মানুষের জীবনে চাকরি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো কবে থেকে? এ কী ধরনের সমাজ গড়ে তুলেছি আমরা?

দীনেন বোস চাকরিটা ফিরে পেয়েছে কিনা, সেটা জানার দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল। ঐ অফিসে আর জীবনে কখনো পা দেবো না প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু দীনেন বোসের বাড়িতে যাওয়ার তো কোনো বাধা নেই। মানুষ কি মানুষের বাড়িতে সৌজন্য বিনিময় করতে যায় না?

ঝোঁকের মাথায় একবালপুরের সেই গলিঘুঁজির মধ্যে দীনেন বোসের বাড়ি খুঁজে উপস্থিত হয়েছিলুম সাড়ে পাঁচটার সময়। ট্যাক্সি নিয়ে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটে।

দোতলায় উঠে সেই দরজাটায় টক টক করতে আগের দিনের মতনই খুলে দিল সেই বিষণ্ণ রমণী। প্রথমে আমাকে চিনতেই পারলো না।

আমি নমস্কার করে বললুম, আমার নাম নীললোহিত, আমি একদিন এসেছিলুম ব্যানার্জিবাবুদের সঙ্গে। একবার দীনেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

দরজার অন্য পাল্লাটা খুলে মহিলাটি বললো, দীনেন এখন নেই। বেরিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমি কি অপেক্ষা করবো, না চলে যাবো?

—আপনার বিশেষ কিছু দরকার ছিল?

—না, সেরকম কিছু না। আপনার কাছ থেকেই জেনে নিতে পারি। দীনেন-বাবু আবার চাকরিতে জয়েন করেছেন?

—ভেতরে আসুন।

তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে কেউ একজন নামতে নামতে থেমে গিয়ে হাঁ করে আমাদের দেখছে, সেইজন্যই বোধ হয় মহিলাটি আমায় ভেতরে ডাকলেন। লোকটির মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের দৃষ্টি সুবিধের না।

মহিলাটি দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের ভেতরটা আগের দিনের মতন ততোটা অগোছালো মনে হলো না। বোধ হয় এদের অবস্থা ফিরেছে। তবে তো খুব ভালো কথা।

পাশের ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে যমজের মধ্যে একটি। আমি কোনো কিছু না ভেবেই তাকে কোলে তুলে নিলুম। খুব ভদ্র বাচ্চা। মুখের কাছে আঙুল নিলেই খটখটিয়ে হাসে। চেনা-অচেনা নেই। এক একটা বাচ্চা অচেনা কারুর কোলে গেলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে, সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হয়!

দীনেনের স্ত্রীর নাম মণিকা। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি হাসলুম। কিন্তু ওর মুখে হাসি নেই। খানিকটা ধারালো গলায় বললো, আপনি তো আরও ভালো পোস্ট পেয়েছেন?

আমি খানিকটা থতোমতো খেয়ে গিয়ে বললুম, হ্যাঁ, মানে, খুব ভালো বলা যায় না। তবে আমাকে আর একটা জায়গায় বসানো হয়েছে। দীনেনবাবু কি অফিস থেকে এখনো ফেরেননি?

মণিকা বললো, ও অফিস যাচ্ছে কে বললো আপনাকে? ওকে তো অফিস থেকে ডাকেনি!

—সে কি। এখনো ডাকেনি?

—আপনার গিপ্ট ফিল করার কোনো দরকার নেই। আপনি তো এখন ওর চেয়ারে আর বসছেন না!

—না, সেজন্য নয়। দীনেনবাবুকে এখনো ডাকেনি কেন?

—এখন শোনা যাচ্ছে, চিঠি দুটো আসলে দীনেন হারায়নি। সব চিঠিই দীনেনের রিসিভ করার কথা, কিন্তু সেই সময় দীনেন সীটে ছিল না। চিঠিদুটো রিসিভ করেছিল পরিতোষ, দীনেনের নাম করে রেখেছিল। তারপর পরিতোষ সে চিঠি দুটোর কথা ভুলে যায়। কিংবা ইচ্ছে করে কোনো কারণে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন জেনে ফেললেও কেউ আর এখন পরিতোষের নাম ডিসক্লোজ করতে চায় না। তাহলে পরিতোষকে সাসপেণ্ড করা হবে। দীনেনও সেটা চায় না। ইউনিয়ানও চায় না। একজনের বদলে আরেকজনকে সাসপেণ্ড করিয়ে লাভ কী? দীনেনের তুলনায় পরিতোষ অনেক বেশি অ্যাকটিভ।

আমি বাচ্চাটিকে কোল থেকে নামিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললুম, কী সাঙ্ঘাতিক কথা! দীনেনবাবু কোনো অন্যায় করেননি, তবু তিনি চাকরি খোয়াবেন?

মণিকা তীক্ষ্ণ গলায় বললো, যারা চাকরি করছে, তারা বুঝি সবসময় ন্যায়-নীতি মেনে চলে?

আগের দিন মনে হয়েছিল, আমার প্রতি মণিকার খানিকটা সহানুভূতি আছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমাকে সে আঘাত করতে চায়। দীনেনের চেয়ারে আমি বসছি না বটে, কিন্তু আমার অন্য চাকরি পাওয়াটাও যেন খুব দোষের!

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লাখ বেকারের মধ্যে হঠাৎ একজন-দুজনের চাকরি পেয়ে যাওয়াটাও বোধহয় খুব ভালগার ব্যাপার। যেন একদল অভুক্ত মানুষের সামনে দেখিয়ে দেখিয়ে কারুর সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়া!

মণিকা দেওয়ালের দিকে ফিরে বললো, দীনেন আজ সকালে বেরিয়েছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। দুপুরে খেতেও আসেনি। সে আর ফিরবে কি না কে জানে!

—সে কি? কোনো খোঁজ করেননি? ব্যানার্জিদের কোনো খবর দেননি? ঠিকানা পেলে আমি ওঁদের কারুকে বলে আসতে পারি।

—আপনি আমার ছেলেটাকে হঠাৎ কোলে তুলে আদর করলেন কেন?

—কেন? একটা বাচ্চাকে আদর করার মধ্যে কি এরকম প্রশ্ন আসে? আমার ঠিক জানা ছিল না।

—আপনি ভালো চাকরি পেয়েছেন। তারপর দেখতে এসেছেন আমরা কী অবস্থায় আছি! দয়া? দয়া করতে চান আমাদের?

—না, না, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।

দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মণিকা আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো। চুলগুলো খোলা, আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে, তাকে দেখাচ্ছে উন্মাদিনীর মতন।

সে বললো, সেদিন আমার ভাই বলেছিল, আপনি চাকরি পেয়েছেন···দীনেন যদি কোথাও চলে যায়, তাহলে আপনাকে ভার নিতে আমাদের ছেলেদের, আমার, এই সংসার! বলেনি? আপনি সেইজন্য এসেছেন?

—না, না।

—তবে কেন এসেছেন? বলুন! বলুন! উত্তর দিন! চুপ করে রইলেন কেন, বলুন?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে এসেছি।

সত্যিই তো। আমি কেন গিয়েছিলুম ওদের বাড়িতে, তা বুঝিয়ে বলা খুব শক্ত। যা ভাষায় বুঝিয়ে বলা যায় না, তাও কি কেউ বুঝবে না?

রাগে-দুঃখে-অভিমানে মাথার ঠিক নেই মণিকার। তাকে কোনো সান্ত্বনা দেবার ভাষাও আমার জানা নেই। আমি সান্ত্বনা দেবার কে!

ট্রামে-বাসে, রাস্তায় কত বেকার ছেলে দেখি, তাদের গায়ে শক্তি আছে, দু-একটা ডিগ্রিও আছে, কিন্তু কোনো কাজ নেই। তাদের অনেকেরই যোগ্যতা নিশ্চিত আমার চেয়ে বেশি। তারা যদি জানতে পারে, আমি দৈবাৎ আমার মামার জোরে একটা চাকরি পেয়ে গেছি, তা হলে তারা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে!

সেই বাড়ি থেকে আমি আজ রাস্তা চিনে ট্রাম লাইনে ফিরে যেতে পারতুম। কিন্তু আগের দিনের ভুল করে হারিয়ে যাওয়া রাস্তাটাও এখন আমার জানা হয়ে গেছে।

সেই নির্জন জায়গা, দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া বাড়ি, একদিকে একটা মস্ত বড় পুকুর কিংবা খাল, আজও সেখানে একটা নৌকো বাঁধা আছে।

এইখানেই নীলা প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আমি তাকে ছুঁয়ে দেখেছিলুম যে সে রক্ত-মাংসের নারী, তার শরীরে উত্তাপ আছে।

দিকশূন্যপুর কি এই নির্জন জায়গার কাছাকাছি? এই সব অঞ্চল ভালো চিনি

না, এখানে কোনো বিরাট শূন্যতা থাকতে পারে। নীলা এখানে খুব সাবলীলভাবে মিলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে।

সেই পুকুরের ঘাটলাটায় গিয়ে বসলুম।

কে আসবে—গুণ্ডারা, না নীলা?

আজ আর মাথা নয়, আমার গলার কাছে ব্যথা-ব্যথা করছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আমার বুঝি অভিমান হতে পারে না?

এটা দীঘি কিংবা খাল যাই-ই হোক, অন্ধকারে ওপরের দিকটা অস্পষ্ট। দু পাশে জন্মে গেছে অনেক আগাছা। জলের রঙ কালো। মাঝে মাঝে ঘাই মারছে মাছ। আজ একজনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না।

একটু বাদে দেখতে পেলুম, পুকুরের ডান ধার দিয়ে এদিকের রাস্তার দিকে হেঁটে আসছে একটি মেয়ে। যারা জানে না, তারা ভয় পেতে পারতো। এরকম সন্ধেবেলা, এত নির্জন, গুণ্ডা-অধ্যুষিত জায়গায় কোনো একা মেয়ে কি আসে? অপার্থিব কেউ হতেও পারে।

কিন্তু নীলা সত্যিই তো অপার্থিব। আমি বুঝে গেছি, সে এই পৃথিবীর কেউ নয়। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। সবচেয়ে বড় কথা, সে শুধু আমার জন্য আসে। আমার এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে এমন পুরস্কার তো আমি আগে কখনো পাইনি।

এজন্য আমার কিছু ত্যাগ করা উচিত। শুধু পাওয়া ভালো নয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছেড়ে দিতেও হয়। এই মুহূর্তে আমার কাছে আর তো কিছু নেই, তাই চটিজুতোজোড়া ঠেলে ফেলে দিলুম জলের মধ্যে।

আগের দিনে গুণ্ডারা আমার হাতের ঘড়ি আর একশো টাকার নোট নিয়ে ঠিক কাজই করেছিল। সেও তো ত্যাগ।

ও কি নীলা, না কেউ? হয়তো কোনো বাড়ির কাজের মেয়ে বাড়ি ফিরছে। কাজের মেয়েদের বিশেষ ভয়-ডর থাকে না। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না শাড়ির রঙ।

মেয়েটি আমার কাছে এসে বসলো। একটা গন্ধ পেয়েই বুঝলুম, এ নির্ঘাৎ নীলা। নীলার নিজস্ব একটা সৌরভ আছে, যা কোনো পারফিউম নয়।

নীলা বসেছে আমার পেছনদিকে। তবু আমি ঘাড় ঘোরালুম না, দেখলুম না তাকে, কথা বললুম না তার সঙ্গে।

এ কি বিচিত্র ব্যাপার! নীলার প্রতীক্ষাতেই এখানে এসে বসে থাকা, অথচ

আমি তাকে এত কাছে পেয়েও দেখছি না। আমার গলার মধ্যে বাষ্প আটকে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত বাদে নীলা আরও সরে এসে আমার পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে, নীললোহিত? তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছো না কেন?

আমি দু'তিনটে বড় বড় ঢোঁক গিলে পরিষ্কার করে নিলুম গলা। তারপর বললুম, নীলা, আমার কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, মাথায় নয় বুকে নয় গলায় নয়। ঠিক জানি না কোথায়, কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে।

নীলা বললো, কেন তোমার এত কষ্ট হচ্ছে, নীললোহিত?

আমি বললুম, কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

নীলা বললো, আমি তো ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই জানি না, নীললোহিত।

—তবে কেন সকালবেলা, তোমাকে দাঁড়াতে বললুম, তবু তুমি চলে গেলে?

—অনেকক্ষণ ধরে যে কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম, তাই আমার শরীর কেঁপে উঠলো।

—কুকুরের ডাক! তুমিও বুঝি কুকুরে ভয় পাও?

—না তো! কিন্তু তোমার মনের মধ্যে একসময় কুকুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি ছিলুম না। তাই আমি আর থাকতে পারলুম না। আমাকে চলে যেতে হলো।

—মনের মধ্যে কুকুর! দা সারকামসাইজড ডগ! তাহলে কি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা কুকুর আছে? আমাদের ফ্ল্যাটে তখন সত্যিকারের কোনো কুকুর ঢোকেনি, ওটা মনের কুকুর? আই টুক বাই দা থ্রোট দা সারকাম-সাইজড ডগ…

—তুমি কী বলছো, বুঝতে পারছি না!

—ও কিছু না। বোধহয় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি হঠাৎ এই উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

—এখানে শুধু শুধু বসে ছিলে কেন? এই জায়গাটা ভালো না। আগের-দিন দুটো লোক তোমাকে বিশ্রীভাবে মেরেছিল। কেন আবার এলে!

—আমি আগে দীনেন বোসের বাড়িতে গিয়েছিলুম। তুমি ওকে চেনো না। প্রথমদিন চাকরিতে যার চেয়ারে তুমি না জেনে বসেছিলে, সেটা তো তোমার

দোষ হতে পারে না!

—তুমি এখবরও জানো? কিন্তু নীলা, আমি যে না জেনে দীনেনের চেয়ারে বসেছিলুম। এটা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। সবাই কেন আমাকে এতটা স্বার্থপর ভাবে! আমার খুব কষ্ট হয়।

—তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও। তুমি কষ্ট পেয়ে আমাকেও কষ্ট দিও না আর।

—নীলা, তুমি না এলে আমি আজ এখানে সারারাত বসে থাকতুম।

—তুমি যদি চাও, আমাকে ধরে রাখো, তাহলে আমিও সারারাত বসে থাকতে পারি এখানে।

—তুমি আমাকে দিকশূন্যপুরে নিয়ে যাবে বলেছিলে!

—এখন যাবে?

—এখান থেকে যাওয়া যায়?

—যে কোনো জায়গা থেকেই তো যাওয়া যায়।

—চলো, চলো। এক্ষুনি চলো। কিসে যাবো? হেঁটে, না কোনো গাড়ি ভাড়া করতে হবে?

—হেঁটে যেতে পারি। ইচ্ছে করলে এই নৌকোটাতেও যাওয়া যায়।

—নৌকোয় যাবো? এটা তো একটা পুকুর?

—না, পুকুর নয়। এটার শেষ নেই। তুমি নৌকো চালাতে জানো, নীললোহিত?

—আমি এরোপ্লেন ছাড়া সব চালাতে জানি। সাইকেল জানি, নৌকো জানি, একবার হাজারিবাগে গিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হবো ঠিক করে গাড়ি চালাতেও শিখেছিলুম। রিকৃশাও টেনেছি কয়েকদিন। শুধু প্লেন আর মহাশূন্যের রকেট জানি না। অবশ্য শুনেছি, রকেট চালাবার জন্য বিশেষ কিছু শিখতে হয় না, তলা থেকেই সবকিছু কন্ট্রোল করে।

—এসো, আমরা নৌকোটায় উঠি।

—এটা কার নৌকো? কেউ কিছু বলবে না?

—এখনো তোমার এত প্রশ্ন! দিকশূন্যপুর যাবার জন্য তো প্রশ্ন লাগে না। এটা বারোয়ারি খেয়ার নৌকো। এর কোনো মালিক নেই।

—তবে চলো, নৌকোতে যাই। আমি নৌকো উল্টে দেবো না। তবু, তুমি সাঁতার জানো তো নীলা?

—তুমি জানলেই তো হবে।

আমরা দুজনে চড়ে বসলুম নৌকোয়। দুটো বৈঠা রাখা আছে, কোনো অসুবিধে নেই। অনেক দিনের অনভ্যেস, প্রথমে একটু টালমাটাল হলো। বাচ্চা মেয়ের মতন জলের মধ্যে হাত দিয়ে খেলা করতে লাগলো নীলা।

তারপর নৌকোটা বেশ সহজ ভাবে চলা শুরু করলো, যেন একটা চোরা স্রোত আছে এই জলে। একটু বাদেই কোথা থেকে কুয়াশা ঘিরে ফেললো আমাদের। তার মধ্যেও নৌকো চলে এলো তরতর করে।

এক সময় নীলা বললো, এবার বাঁধো।

আমি খানিকটা অবিশ্বাসের স্বরে বললুম, এত কাছে?

নীলা বললো, এ আমার নিজস্ব দিকশূন্যপুর। এর কোনো জায়গা লাগে না। যেখানে ইচ্ছে বানিয়ে নেওয়া যায়।

পাড় বা ঘাট দেখা যাচ্ছে না, তবু নৌকোটা ঠেকলো কোনো শক্ত জায়গায়। বৈঠা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমি নীলার দিকে হাত বাড়িয়ে বললুম, এসো।

নীলা বললো, এখানে তুমি কিছু চিনবে না। আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো।

আমি বললুম, কুয়াশায় যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গরম কালের রাতে এমন কুয়াশা এলো কোথা থেকে? নাকি ধোঁয়া?

নীলা বললো, ফুঁ দাও, একটু একটু করে সরে যাবে।

ওপরটা বেশ পিছল। ঠিক কাদা নেই, তবু যেন পায়ের তলা সড়সড করে। আমার খালি পা। আমি শক্ত করে ধরে রইলুম নীলাকে।

যেন আমরা শিশু হয়ে গেছি, পৌঁছেছি এক রূপকথার জগতে। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ফুঁ দিয়ে সরাচ্ছি কুয়াশা।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এখানে আর কেউ আসে না?

নীলা বললো, এই তো তুমিই এলে প্রথম!

—আমি আর ফিরে যাবো না। চাকরিটাকরি কিছু আর ভালো লাগে না আমার। তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও অন্য কোথাও থাকতে চাই না।

—আমিও তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারি না, নীললোহিত। বার বার কাঁচের টুকরোর মতন ভেঙে ভেঙে যেতে আমার ভালো লাগে না।

—এখানে বাড়ি আছে? কোনো গাছপালা আছে?

—আমার একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে খুব মজার

একটা জিনিস দেখাবো। তুমি নির্ঘাৎ চমকে যাবে।

—কী দেখাবে নীলা ? কী দেখাবে ?

—আগে পৌঁছোই ! হ্যাঁ, এখানে গাছও আছে। পাশেই তো একটা, তোমার হাত বাড়াও !

কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না, তবু হাত দিয়ে আমি ছুঁতে পারলুম একটা গাছ। বেশ বড। গুঁড়িটা টের পাচ্ছি, পাতা খুঁজে পাচ্ছি না।

—এটা কী গাছ ?

—এটা একটা চাঁপা ফুলেব গাছ। উর্বশী চাঁপা। বারোমাস ফুল হয়। ভারি সুন্দর গন্ধ।

—চাঁপা ফুল আমার খুব প্রিয়। ফুল পাড়া যাবে না ?

—অনেক উঁচুতে ফুল। কুয়াশা সরে যাক, তারপর চেষ্টা করো।

আমি নীলার হাতটা আমার মুখের কাছে এনে তার আঙুলগুলোতে চুমু খেলাম। আমাব শরীর কাঁপছে। আমার অন্তরাত্মা কাঁপছে। বিকেল ও সন্ধের মধ্যে এত তফাৎ !

গাছতলায় একটুক্ষণের জন্য দাঁড়ালুম আমরা।

বিকেলবেলার দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ফিরে এলো। ফুঁ দিয়ে কুয়াশা সরানো যায় কিন্তু সেই মনের ছবিটা সরানো যায় না। অপমানিত হয়ে আমি মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসছি একটা বাড়ি থেকে।

আমি বললুম, দীনেন বসুর স্ত্রী মণিকা আমাকে বড্ড কষ্ট দিয়েছে আজ। আমার উদ্দেশ্যটাকে কেন অবিশ্বাস করলো ! একটা শিশুকেও আদর করা দোষের ! চাকরি পেয়েছি বলে আমি যেন একটা দুর্বৃত্ত। আমার নোংরা হাতে একটা শিশুকেও স্পর্শ করা যায় না।

নীলা বললো, ও কথা আর মনে রেখো না !

আমি বললুম, ভুলতে পারছি না যে ! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে !

নীলা বললো, আমি আদর করে তোমার কষ্ট ভুলিয়ে দেবো !

আমি বললুম, দাও আদর দাও। এ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে কিছু চাই নি। শুধু একবার,···আমি কি বোকা, বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে কুড়ি টাকা চেয়েছিলুম !

খিলখিল করে হেসে নীলা বললো, আহা রে, সেই কুড়ি টাকার শোক ! দিক-শূন্যপুরে এসে টাকার কথা বলতে নেই, তা জানো না ?

আমি অসহায়ভাবে বললুম, মনটা কিছুতেই পরিষ্কার হতে চায় না। এই সব ছোটখাটো কথা ঘুরে ফিরে আসে। তুমি আদর দিয়ে ভুলিয়ে দাও।

নীলা আমার সামনে চলে এলো।

কুয়াশায় আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু অকূল সমুদ্রে লাইটহাউসের মতন দেখতে পাচ্ছি তার উজ্জ্বল মুখ। এখন সেই মুখখানি দারুণ চেনা মনে হচ্ছে। তার চিবুকের ডৌল, তার কানের লতি, তার উড়ন্ত ভুরু, সবই খুব চেনা।

আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো নীলা। তার মুখের মধ্যে চাঁপা ফুলের গন্ধ।

চুম্বনটি অসমাপ্ত রেখেই সে ছিটকে সরে গিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে বললো, একী, তুমি কাঁপছো, নীললোহিত? তোমার জ্বর হয়েছে নাকি?

আমি বিপন্ন গলায় বললুম, কাঁপছি? না, না, আমার জ্বর হয়নি। মনে হচ্ছে যেন ঝড় উঠেছে।

নীলা বললো, তা হলে সত্যি ঝড় উঠেছে। আমার হাত ধরে থাকো। তুমি চলে যেও না। তুমি চলে যেও না।

আমি বললুম, আমি যেতে চাই না। আমায় ধরে থাকো।

কিন্তু হাত বাড়িয়েও আমি নীলাকে আর ধরতে পারলুম না। একটা সত্যিকারের প্রবল ঝড় আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে গাছপালার। নীলাকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

আমি বলতে লাগলুম, নীলা, আমাকে যেতে দিও না, আমি যেতে চাই না!

অনেক দূর থেকে নীলার গলা শোনা গেল, নীললোহিত, চলে যেও না, চলে যেও না!…



মেজমামা জঙ্গীপুরের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এলেন একটু তাড়াতাড়ি। ভন্তুর ফ্ল্যাট বানানোর কাজ পড়ে আছে, সে বেশিদিন কলকাতার বাইরে থাকতে পারবে না। ভন্তুকে চলে আসতে হলো বলেই মেজমামা আর সেখানে রইলেন না। কলকাতা ছুঁয়ে তিনি আবার যাবেন পুরুলিয়ায়। সেখানকার এক আদিবাসীদের গ্রামে ওঁর কোনো বন্ধুর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রজেক্ট আছে, সেই গ্রামে থাকবেন কয়েকদিন।

সকালবেলা চায়ের টেবিলে মেজমামা বললো, বুঝলে ছোড়দি, এবার একটা টেস্ট কেস করলাম। তোমাদের এখানে সুটকেসটা রেখে শুধু একটা হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছি বলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুব হতাশ!

মা বললেন, কেন, কী হয়েছে?

মেজমামা বললেন, অন্যবার আমার বউ সঙ্গে থাকে। তার কী রকম খরচের হাত তুমি জানো না। এত রোজগার করি, তবু আমাকে ফতুর করে দেয়। প্রত্যেকবার দেশে আসবার সময় নিজের গাদা-গুচ্ছের ভাই-বোন, মা-বাবা, পিসি-মাসি, বাড়ির রাঁধুনী, রাখাল এদের জন্য শাড়ি, জামা, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, পারফিউম, কলম, স্নো-পাউডার এইসব হাবিজাবি জিনিস নিয়ে আসে। আমার শ্বশুর বিরাশি বছরের বুড়ো, চোখে ভালো দেখতে পায় না, চিরকাল হাতের কর গুনে গুনে টাকাপয়সার হিসেব করেছে, গতবার তাকে এনে দিয়েছে একটা ক্যালকুলেটার। বুঝে দ্যাখো! সেই অন্ধ ঐ ক্যালকুলেটার দিয়ে কী করবে?

মা বললেন, তোর কথাবার্তার কি ছিরি রে পিণ্টু! শ্বশুর সম্পর্কে কেউ ঐভাবে বলে? তিনি অতি ভালোমানুষ।

মেজমামা বললেন, আহা, ভালোমানুষরা বুঝি বুড়ো হয় না? অন্ধ হতে পারে না? আরও মজার কথা শোনো! আমার টাকার শ্রাদ্ধ করে তোমার বৌমা এত লিপস্টিক আর পারফিউম আর স্নো-পমেটম আনে, যে শেষ পর্যন্ত সেগুলো গড়াগড়ি যায়। ঐ গ্রাম দেশে কে লিপস্টিক মাখবে বলো তো? চতুর্দিকে

গোবরের গন্ধ, তার মধ্যে ফ্রেঞ্চ পারফিউম মাখারই বা কী দরকার? গোবরের গন্ধই তো অতি চমৎকার!

বৌদি যেন সত্যি সত্যি গোবরের গন্ধ পাচ্ছে, এইভাবে নাকে আঁচল চাপা দিল।

মেজমামা বললেন, গতবারেই একদিন দেখি, ও-বাড়ির বুড়ি রাঁধুনিটা ঠোঁটে রং মেখে বসে আছে একদিন। আর বাড়ির রাখালটা হেঁটো ধুতি ছেড়ে একটা সুইমিং ট্রাকস্যুট পরে গরু চরাতে যাচ্ছে। একে কালচারাল পলিউশান বলে না? বাজে জিনিস দিয়ে গ্রামের লোকের স্বভাব নষ্ট করা! তাই এবার কিছু আনিনি। সব ফক্কা।

মা বললেন, কিচ্ছু আনিস নি? শাশুড়ীর জন্য অন্তত একখানা শাড়ি?

মেজমামা বললেন, কেন আনবো? তুমি আমার নিজের ছোড়দি, তোমার জন্য শাড়ি দেবার কথা মনে থাকে না তোমার বৌমার, আর নিজের মায়ের জন্য, ভাইয়ের বৌ আর বাপের বাড়ির চোদ্দগুষ্ঠির জন্য গুচ্ছের দেওয়া চাই। সেই জন্য এবার বলেছি, নাথিং ডুয়িং! আমি কিছু নেবো না। তুমি নিজে যখন যাবে, তখন যা খুশি নিতে পারো, কিন্তু আমি শ্বশুরবাড়ির জন্য মোট বইবো না, ব্যাস, অমনি দুনিয়াটা কত পাল্টে গেল! অন্যান্যবার শ্বশুরবাড়িতে কত খাতির পাই, চব্য-চোষ্য লেহ্য পেয় কিছুই বন্ধ থাকে না। এবার থার্ড দিন থেকেই দেখি সকালে চায়ের সঙ্গে আর টা দেয় না! খালি পেটে শুধু চা! একখানা বিস্কুট পর্যন্ত না!

একখানা বেশ দম-ফাটানো হাসি দিয়ে মেজমামা আবার বললেন, কয়েকটা দিন ওদের খুব সাসপেন্সে রেখেছিলুম। সবাই ভাবছে, আমি বুঝি মজা করছি। জিনিসগুলো অন্য কোথাও লুকানো আছে। সবাই আমার মুখের দিকে কী পাবো, কী পাবো বলে তাকায়। কেউ কেউ আবার মনে করিয়ে দেয়, সিঙ্গাপুরের সিল্ক খুব ভালো, ঘড়ি শস্তা। আমার এক শালী তো জিজ্ঞেস করে ফেললো, দিদি কোনো চিঠি দেয়নি? আসলে দিদির জন্য কেউ ব্যস্ত নয়। কিন্তু চিঠি থাকলেই তার মধ্যে জিনিসপত্রের উল্লেখ থাকবে। কার জন্য কোন্‌টা পাঠানো হলো, সব লিখে দেয়। এবারে খুব ঠকিয়েছি।

আমি বললুম, আপনিও তো ঠকেছেন! খাতির কম পেয়েছেন!

মেজমামা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, আরে যা যা। খাতিরের চেয়েও মানুষের ব্যবহার দেখে আমি মজা পাই বেশি। ফরেন জিনিস পায়নি বলেই সবার মুখ ভার হয়ে গেল। অথচ ওদের কিন্তু কোনো জিনিসের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখে

গেছেন, এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, যার আছে ভুরি ভুরি।

বৌদি জিজ্ঞেস করলো, সত্যি কিছু আনেননি এবারে, মেজমামা?

মেজমামা বললেন, কেন, তোমারও লোভ ছিল বুঝি, অলকা?

বৌদি বললো, বাঃ, লোভ থাকবে না! আপনি আমাদেরও কারুকে কিছু দ্যাননি বলে এ বাড়িতেও আপনার খাতির কমে গেছে খানিকটা তা লক্ষ করেননি?

মেজমামা বললেন, হুঁ, লক্ষ করেছি বটে। প্রথম দিন খাওয়ালে ইলিশ মাছ যত খুশি আর সন্দেশ। পরের দিন কাটাপোনা মাত্র দু' পীস। তার পরের দিন ছোট ট্যাংরা। এবাবে কি ময়দানে গিয়ে ফড়িং ধরে ধরে খেতে হবে!

মা বললেন, পিণ্টুর যত সব অলক্ষুণে কথা! তুই নিজেই তো বলেছিলি ছোট ট্যাংরা মাছ তুই খুব পছন্দ করিস!

মেজমামা বললেন, যাই বলো, ছোড়দি, অলকার ব্যবহার একটু একটু বদলে গিয়েছিল ঠিকই, অলকা বোধহয় আশা করেছিল সিল্কের শাড়ি পাবে! এবারে ঢুঁ, ঢুঁ! আর এই নীলুটা, তুইও কিছু আশা করেছিলি নিশ্চয়ই। কী নিমকহারাম রে তুই, তোর একটা চাকরি জুটিয়ে দিলুম, তবু তুই আমাকে একদিনও খাওয়ালি না?

আমি বললুম, এখনো মাইনে পাইনি, মেজমামা! ট্রাম বাস ভাড়া পর্যন্ত ধার করতে হয়!

মেজমামা বললেন, পয়লা তারিখ আসেনি বুঝি? তারিখের হিসেব নেই। ঠিক আছে, পয়লা পর্যন্ত আমি এখানেই থেকে যাবো। সেদিন বাড়িতে একটা বিরাট খ্যাঁটের ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝলি! কয়েকজনকে ডাকতে হবে। সুরঞ্জন তো আসবেই। আর নির্মল আর রথীনকেও ডাকবো। ও ব্যাটারা বলেছিল না, চাকরি জোটানো এখন অসম্ভব! ওদের দেখিয়ে দিতে হবে।

মা বললেন, হ্যাঁ, নীলু প্রথম মাইনে পেলে কিছু লোকজনকে খাওয়াতে হবে। আর সেদিন একটা পুজো দিয়ে আসতে হবে কালীঘাটে।

মেজমামা বললেন, কালীপুজোও মাইনে পাবার পর! ওটা বুঝি ধারে দেওয়া যেত না! নাকি মা কালীকে আস্ত পাঁঠা খাওয়াবে!

মা ধমকে বললেন, ছিঃ পিণ্টু!

আমি বললুম, মেজমামা, আমার ঘরে আপনি যে স্যুটকেসটা রেখে গেছেন, সেটা অত ভারি কেন?

দড়াম করে চেয়ারটা ঘুরিয়ে মেজমামা বললেন, অ্যাঁ! তুই সেটা খোলার চেষ্টা করিছিলি নাকি? তালা ভেঙেছিস?

আমি হেসে বললুম, সে সব কিছুই করিনি। আমার খাটটা একবার সরাতে হয়েছিল, তাই ওটাকেও সরাতে হয়েছিল। ভেতর থেকে চকলেটের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

—চকলেট? চকলেটগুলো এখনো বার করিনি? অনেক কেক-মেকও এনেছিলুম যে, সেইগুলো এই গরমে গলে গেল বোধহয়! যা লোডশেডিং-এর ধাক্কা!

—তুমি এবার কিপ্টের মতন কিছু বার করোনি।

—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, স্যুটকেসটা শিগগির নিয়ে আয়।

অত বড় স্যুটকেসটা টেনে এনে টেবিলের ওপর তুলতে আমার ঘাম ছুটে গেল। এই সব ভারি স্যুটকেস নিয়ে অন্য লোকরা বিভিন্ন এয়ারপোর্ট দাবড়ে বেড়ায় কী করে? যারা বিদেশে ঘোরাঘুরি করে, তাদের রীতিমত কব্জির জোর দরকার!

মেজমামা পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি বার করে স্যুটকেসটা খুলতেই যেন চিচিং ফাঁক-এর মতন একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

থরে থরে উপহার দ্রব্য সাজানো তার মধ্যে। শাড়ি-শার্ট-প্যাণ্ট-পারফিউম ইত্যাদি। ওপর দিকে চকলেট কেকের কয়েকটা প্যাকেট, সেগুলো গলে চেপ্টে অন্য জিনিসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে।

মা বললেন, ইস কী করেছিস, পিণ্টু! স্যুটকেসটা খুলিস নি একবারও!

মেজমামা বললেন, হ্যাণ্ডব্যাগেই জামাকাপড় ছিল, তাতেই কাজ চলে যাচ্ছিল। আরও খুলিনি কেন জানো, ছোড়দি? দ্যাখো, আমার বউটা সব জিনিসের ওপর কে কোনটা পাবে নাম লিখে লিখে পিন দিয়ে সেঁটে দিয়েছে। তোমার নামে আর অলকার নামে যদি কিছু না পাঠিয়ে থাকে, তা হলে কি লজ্জার কথা বলো তো!

মা বললেন, আহা, আমাদের জন্য আবার প্রত্যেকবার জিনিস আনতে হবে কেন? আগে দু'তিনবার তো দিয়েছে। মোটেই আমাদের জন্য আর কিছু আনতে হবে না।

মেজমামা বললেন, এরকম কথা ভদ্রতা করে সবাই বলে। আমি চলে গেলেই তুমি আর অলকা গুজগুজ করে বলতে, পিণ্টুটা তো বটেই, ওর বউটাও এমন হাড়-

কঞ্জুষ হয়েছে! এতদিন এ বাড়িতে থেকে গেল, একটা কিছু জিনিস আনলো না আমাদের জন্য! পিণ্টুর শ্বশুরবাড়ির লোকরাই সব কিছু পেল!

বৌদি বললো, মা এরকম কিছু না বললেও আমি কিন্তু বলতুম, মেজমামা। অন্তত মনে মনে।

মেজমামা বললেন, এই অলকা সত্যি কথা বলে বলেই তো আমি ওকে পছন্দ করি। তবে এটা বোঝো না, অলকা, আমি আসলে তোমাদের খরচ বাঁচিয়ে দিই। আমার বউ তোমাদের জন্য একটা হাবিজাবি জিনিস পাঠালেই তোমরাও চক্ষুলজ্জায় তার জন্য উল্টে কিছু কিনে দেবে। শুধু শুধু কিছু টাকা গচ্চা!

মা বললেন, জিনিসগুলো ভক্তর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দে।

আমি বললুম, এই চকলেটগুলো আর পাঠানো যাবে না। গলেটলে একেবারে যা-তা হয়ে গেছে। এগুলো আমরা খেয়ে নিতে পারি।

ল্যাতপেতে হয়ে যাওয়া প্যাকেট দুটো সাবধানে তুলে রাখা হলো দুটো প্লেটে। তলাগুলো ছিঁড়ে গলে যাওয়া চকলেট আইসক্রিম মেশামিশি হয়ে লেগে গেছে অনেক জামাকাপড়ে। আমি আঙুল দিয়ে চেঁছে চেঁছে তুলতে লাগলুম সেগুলো।

তারপর ইউরেকা! ইউরেকা! বলে চেঁচিয়ে উঠলুম।

একটা সোনালি রঙের শাড়ির ওপর লেখা রয়েছে 'অলকার জন্য'।

শাড়িটা তুলে ধরে বললুম, বৌদি, তোমার জিনিস এসে গেছে! তোমার জন্য শাড়ি!

মেজমামা বললেন, এঃ, চকলেট লেগে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এ শাড়ি কি আর কারুকে দেওয়া যায়? ছিঃ!

বৌদি বললো, ও কিছু হবে না, একটু জল দিয়ে ঘষলেই উঠে যাবে। দাগ পড়বে না। রংটা কি ভালো!

মা বললেন, দেখি, দেখি! বাঃ শাড়িটার জমি কত ভালো। ওদেশে এত ভালো শাড়ি পাওয়া যায়? ওখানে মেয়েরা কি শাড়ি পরে?

মেজমামা বললেন, ওখানে সব পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান কম নাকি? জানো ছোড়দি, ওখানে সেরাঙ্গুন নামে একটা রাস্তা আছে, সেখানে গেলে তোমার মনে হবে, তুমি ইণ্ডিয়ার কোনো শহরে ঢুকে পড়েছো। সব ইণ্ডিয়ানদের দোকান, শাড়ি পরা মহিলারা ঘুরছে, দাড়িওয়ালা শিখ শুয়ে আছে রাস্তায় খাটিয়ে পেতে। মার্কেট স্ট্রীট, ট্যাঙ্ক রোড এসব জায়গাতেও অনেক ভারতীয় আছে। থাইল্যাণ্ড,

মালয়েশিয়া থেকে ভালো ভালো সিল্কের শাড়ি আসে।

আমি এসব শুনছি না, সুটকেস ঘাঁটাঘাঁটি করে আমি বৌদির নাম লেখা আর একটা প্যাকেট পেয়ে গেলুম, এটার মধ্যে রয়েছে দামি একটা পারফিউমের শিশি।

মেজমামা বললেন, তা হলে অলকা, এবার আর আমাকে আড়ালে গালাগাল দেবে না তো?

বৌদি লজ্জা-খুশী মাখানো মুখে বললো, এই পয়জন পারফিউমটার জন্য আমার অনেক দিনের শখ ছিল। ইস, এত দাম দিয়ে কেন আনলেন?

আমি আবার একটা প্যাকেট তুলে চ্যাঁচালুম, দাদার জন্য শার্ট!

মেজমামা বললেন, তোর জন্য কিছু নেই, নীলু? দ্যাখ দ্যাখ, খুঁজে দ্যাখ! তোর মামী কি তোর কথা ভুলেই গেল?

আমার জন্যও পাওয়া গেল একটা খুবই ছোট প্যাকেট, তাকে প্যাকেট না বলে প্যাকেটিকা বলা উচিত। তার মধ্যে রয়েছে দুটো শস্তার লাইটার। থো অ্যাওয়ে টাইপ।

মেজমামা বললেন, যাক, তাহলে সবার জন্যই কিছু না কিছু পাওয়া গেল! তুমি একটু চকলেট খাও, ছোড়দি। নীলুটার জন্য খুব কম খরচে সেরেছে। ঠিক আছে, নীলু, তোকে আমার ঘড়িটা দিয়ে যাবো। তোর ঘড়ি সেদিন ছিনতাই হয়ে গেল। তুই এটা পরবি।

—আমার ঘড়ি ছিনতাই হয়নি, সেটা ছিল দাদার ঘড়ি। তুমি দাদাকেই ঘড়িটা দিও।

—তোর দাদার তো আর একটা ঘড়ি আছে দেখেছি। এটাই তোকে দিলুম।

—আমায় দিও না, মেজমামা। আমি ঘড়ি পরি না কক্ষনো।

—কেন ঘড়ি পরিস না?

—ঘড়ি না থাকলে ছিনতাইবাজদের জব্দ করা যায়। তারা ধারে কাছে ঘেঁষে না। আমার লাইটারই খুব পছন্দ। ঘড়ি নিলেই আমি হারাবো।

মেজমামা নিজের হাত থেকে রোলেক্স ঘড়িটা খুলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, থাক তা হলে।

মা আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চোখের পাতা সামান্য কাঁপছে। মায়ের ইচ্ছে, ঘড়িটা আমি নিয়ে নিই। নিজের ভাইয়ের চেয়ে নিজের

ছেলের প্রতি তাঁর টান বেশি। মা বোধহয় এ-ও ভাবছেন, আমার ছোট ছেলেটা বড্ড বোকা!

মায়ের দিকে ফিরে মেজমামা বললেন, একি ছোড়দি, তুমি একটুও চকলেট খেলে না? একটু খেয়ে দ্যাখো, ওদেশের চকলেট দারুণ ভালো!

মা নিরস একটা ছোট্ট হাই তুলে বললেন, নাঃ, আমি ওসব খাবো না, তোরা খা। আমি এখন চান করতে যাই।

মা উঠে দাঁড়াতেই মেজমামা আবার মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হা-হা-হা-হা করে হেসে মায়ের একটা হাত চেপে ধরলেন।

তারপর বললেন, ধরা পড়ে গেলে, ছোড়দি, তুমি ধরা পড়ে গেছ!

মা বললেন, আমি আবার কী করলুম?

মেজমামা বললেন, এই একটু আগে বললে, কোনো জিনিস টিনিস চাই না। কেন জিনিস আনবি? এখন যে-ই দেখলে, অন্যদের জন্য আনা হয়েছে, এমন কি তোমার পুত্রবধূও শাড়ি-টাড়ি পেয়েছে, কিন্তু তোমার জন্য কিছু নেই, অমনি তোমার মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল! নীলু, অলকা, তোমরা বলো ঠিক কিনা?

আমি আর বৌদি চোখাচোখি করলুম। মায়ের জন্য কিছু নেই, এই কথাটাই আমাদের দু'জনের মনেও খচ্‌খচ করছিল।

মা বললেন, যাঃ আমি বুড়ো হয়েছি, আমি এখন আর জিনিস নিয়ে কী করবো! ওদের জন্য এনেছিস, সে-ই তো যথেষ্ট!

মেজমামা বললেন, এটাও অভিমানের কথা। তুমি ভাবছো, বয়েস হয়েছে বলে তোমায় বাতিল করে দেওয়া হয়েছে! তাই একটু চকলেট পর্যন্ত মুখে দিলে না!

স্যুটকেসের একেবারে তলার দিকে হাত ঢুকিয়ে মেজমামা একটা বড় কাগজের বাক্স তুলে এনে বললেন, দ্যাখো, এটাতে কোনো নাম লেখা নেই। আমি আর কোনো রিস্ক নিইনি। যদি আমার বউটা তোমাকে ফাঁকি দিতে চায়, তাই আমি নিজে এই শাড়িটা তোমার জন্য কিনে এনেছি, ছোড়দি।

বাক্সটা খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে রয়েছে একটা গরদ-সিল্কের শাড়ি, বেশ দামি তো বটেই।

মা আর খুশীর চমক লুকোতে পারলেন না। আমি যে ঘড়ি নিইনি, সেই দুঃখ পর্যন্ত ভুলে গিয়ে বললেন, ইস, দেখেছো, শুধু শুধু আমার জন্য এত টাকার জিনিস··· তুই বউয়ের নামে বড্ড বদনাম করিস, পিণ্টু। এটা নিশ্চয়ই টুলু নিজে পছন্দ করে কিনেছে! ছেলেরা এরকম কিনতে পারে না!

বৌদি বললো, মায়ের শাড়িটা সবচেয়ে ভালো।

মেজমামা বললেন, হিংসে করো না, হিংসে করো না।

বৌদি বললো, একটু আধটু হিংসে করা স্বাস্থ্যকর ব্যাপার। মায়েরটা সবচেয়ে ভালো, সে কথা বলতে পারবো না? কিন্তু আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ, মেজমামা! এগুলো সব বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন এতদিন! পরশুদিন একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলুম, এই শাড়িটা আগে পেলে সেদিন পরে যেতে পারতুম। সবাই দেখতো।

মেজমামা এক টুকরো চকলেটে কামড় দিয়ে বললেন, সাসপেন্সে রাখলে চমকটা বেশি হয়। সেই খুশির ভাবটা আমার দেখতে ভালো লাগে। নীলুর জিনিস একটু কম হয়ে গেল, কিন্তু নীলুকে আর একটা কত বড় উপহার আমি এবার দিয়েছি, সেটা বলো? নীলুর চাকরিটা!

মা এবার আন্তরিকভাবে বললেন, তুই এবার কিছু না আনলেও কোনো কিছুই মনে করতুম না রে পিণ্টু! কিন্তু তুই এটা যা উপকার করে গেলি···নীলু যে কোনোদিন চাকরি পাবে, সে আশাই তো ছেড়ে দিয়েছিলুম প্রায়!

আমার দিকে খানিকটা গর্ব-মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেজমামা বললেন, এবারে এসে আমিও বড় আনন্দ পেয়ে গেলুম গো! তোমাকে বড় মুখ করে বলেছিলুম, কিন্তু দু'জন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিরিয়ে দেবার পর···তোমার ছেলে নিজের মেরিটে চাকরি পেয়েছে, শেষ পর্যন্ত কারুকে ধরাধরি করতে হয় নি, সুরঞ্জনের কাছে গিয়ে আমরা চাকরির কথা উচ্চারণও করিনি। চাকরিটা যেন নীলুর জন্য আকাশ থেকে পড়লো, জাস্ট লাইক উআইল্ড ফল! মাইনেটাও মোটা-মুটি মন্দ নয়।

মা বললেন, এখন ভালোয় ভালোয় চাকরিটা পাকা হয়ে গেলেই হয়।

মেজমামা বললেন, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। পাকা হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো। তোমার ছেলে খুব মন দিয়ে কাজ করছে। সুরঞ্জন খুব প্রশংসা করছিল। ওদের বম্বের হেড অফিস থেকে গ্যাডগিল নামে খুব এক বড় সাহেব এসেছিল, সে পর্যন্ত নীলুর পিঠ চাপড়ে গেছে!

বৌদি বললো, নীলুও মন দিয়ে চাকরি করতে পারে? শুনতে কেমন যেন লাগে! পৃথিবীতে কোনো কিছুই তা হলে অসম্ভব নয়!

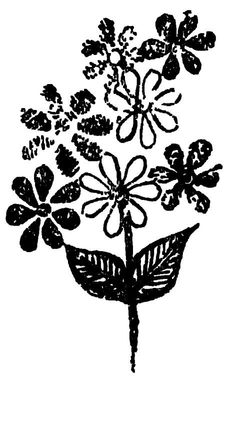
আর একখানা চকলেট মুখে পুরে মেজমামা বললেন, পয়লা তারিখ তবে কবে পড়ছে? শনিবার? খুব ভালো দিন। একটা জমপেশ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা

করতে হবে সেদিন। তোমরা কাকে কাকে ডাকবে লিস্ট করে ফেল। আমার কয়েকজন বন্ধুকে বলতে হবে, সুরঞ্জন তো থাকবেই, নির্মল আর রথীনকে ডেকেও আচ্ছা করে খাওয়াবো···চিংড়িমাছ যদি পাওয়া যায়···

মা আর মেজমামা মুখে মুখে নেমন্তন্নের লিস্ট আর খাদ্যতালিকা বানাতে লাগলেন। আমি উঠে পড়লুম সেখান থেকে।

চাকরির প্রসঙ্গ আসতেই নীলার কথা দারুণভাবে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। নীলা কোথায়? তিনদিন তার দেখা পাইনি। একটা আকস্মিক বদখৎ ঝড় আমাদের আলাদা করে দিয়েছে।

আর কি কোনোদিন নীলার দেখা পাবো না? এই চাকরির খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকবো সারা জীবন?





গেটের দু'পাশে দু'জন দারোয়ান বেশ কর্তব্যপরায়ণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে যে আসল দারোয়ান নয়, সেই ছদ্মবেশী সহদেব পালের ব্যবহারই বেশি বেশি দারোয়ানের মতন। সে আমাকে দেখে একটা স্যালুট দিল জুতো ঠুকে। আগের দিন দেখেছি, সে খৈনী খাওয়াও রপ্ত করেছে।

এক নম্বর গোডাউন থেকে বেরিয়ে দু' নম্বরের দিকে যেতে গিয়ে মিথিলাবাবু থমকে দাঁড়ালো। চেয়ে রইলো আমার দিকে, কিন্তু কোনো কথা বললো না। আমার সঙ্গে সে আজকাল প্রায় কথাই বলে না। আমার ঘরে তাকে রোজ দু'বার করে অন্তত আসতেই হয়, বিশেষ এক ধরনের কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হুঁ-হাঁ করে কাজ সারে।

এই অফিসের কারুর সঙ্গেই আমার এ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হলো না। তার জন্য আমার একা-চোরা স্বভাবটাই দায়ি! আমি যেতে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও তুলতে পারি না চট করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলুম দোতলায়। বারান্দাটা যেন বড় বেশি ফাঁকা। সেদিনের পর আর একবারও নীলা এসে এখানে দাঁড়ায়নি। জলাটায় আজও অনেক বক এসেছে। দুটো খুব সুন্দর মাছরাঙা উড়ে গেল পাশাপাশি। খানিকটা দূরে কয়েকজন লোক জলে নেমে কচুরিপানা সাফ করছে। কচুরিপানা নদী-নালা-পুকুরের অনেক ক্ষতি করে ঠিকই, কিন্তু এই বেওয়ারিশ ধরনের জলাটায় যেন কচুরিপানাই মানায়।

আমি না এলে এ ঘরটার তালা খোলা হয় না। আজ আমার পনেরো মিনিট লেট। এই প্রথম। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু লজ্জিতভাবে সিগারেট ধরালুম।

ঘরের চাবি দারোয়ানদের জিম্মাতেই থাকে। সহদেব নয়, অন্য একজন পুরোনো দারোয়ান চাবি নিয়ে এলো। তার পেছনে ছুটতে ছুটতে এলো পল্টু। সে রীতিমতন হাঁপাচ্ছে।

দরজা খোলার পর পল্টু বললো, ট্রেন আটকে গেছিল, ওঃ, কী কষ্ট করেই যে আজ এসেছি !

আমি হাজিরা খাতা খোলার পর পল্টু বললো, আপনিও এইমাত্র এসেছেন, আমি দূর থেকে ঢুকতে দেখলুম আপনাকে ! আমায় লেট মার্ক করলে আপনার নিজেরটাও করতে হবে !

পল্টু ক্লাস ফোর হলেও আমায় বেশ ধমকে ধমকে কথা বলে।

আমি নিজের নামের পাশে একটা লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে বললুম, তোমায় লেট মার্ক করছি না।

পল্টু তাতেও খুশী হল না। সে বললো, আজ আমায় স্যার যেতেও হবে একটু তাড়াতাড়ি। আমার মায়ের শরীর ভালো নেই। বড্ড বাড়াবাড়ি।

এখানকার অনেকেই জেনে গেছে যে পল্টু সারা বছর ধরেই বাবা কিংবা মায়ের অসুখের অজুহাত দেয়। এক সপ্তাহ অন্তর এক একজনের। কেউ কেউ বলে, পল্টুর বাবা কিংবা মা কেউ আসলে বেঁচেই নেই।

পল্টু তার হাতের চটের ঝোলা থেকে দুটি বেশ বড় হরলিকসের ভর্তি শিশি বার করে বললো, এ দুটো আমি বাইরে থেকে কিনে এনেছি। নিজের পয়সায়। আপনার এখানে রেখে যাবো ?

আমি ভুরু কুঁচকে বললুম, এখানে রেখে যাবে কেন ?

পল্টু নাকি-নাকি গলায় অভিযোগের সুরে বললো, আমায় বেরোবার সময় তো দারোয়ানরা ধরবে। বলবে, এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার কাছে রাখুন, আপনি তখন টিকিটে লিখে দেবেন।

পল্টুর মতন একজন লোকের দু'খানা হরলিকসের শিশি একসঙ্গে কেনার কোনো যুক্তি আছে কি ? বিশেষত এখন মাসের শেষ! এমন কথা শোনা গেছে যে পল্টু এখানকার সাপ্লায়ারদের কিংবা বড় বড় ক্রেতাদের অফিসে বা দোকানে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস চায়, বখশিশও দাবি করে। তা সে অফিসের বাইরে যা ইচ্ছে করুক। আমার দেখার দরকার নেই।

আমি কড়া গলায় বললুম, না, ওসব এখানে রাখা চলবে না। দারোয়ানদের দেখিয়ে, যদি ওদের কাছে রেখে দিতে পারো তো সেই চেষ্টা করো।

পল্টু গজগজ করতে করতে চলে গেল।

দারোয়ানদের কাছে রাখার কী অসুবিধে, তাও অনুমান করা শক্ত নয়। দারোয়ানরা নির্ঘাৎ শিশি দুটোর উৎস বুঝতে পেরে একটা নিজেরা রেখে দেবে।

আমার আগে অন্য যারা পৌঁছেছে, তারা একে একে নাম সই করতে এলো। প্রত্যেকে পাতা উল্টে দেখে গেল, আমি আমার নামের পাশে লাল ঢ্যাঁড়া মেরেছি কিনা।

আজ আমি বিভূতিভূষণের আরণ্যক এনেছি। যতবার ইচ্ছে পড়া যায়, পড়লে মন ভালো হয়ে যায়। আমার এই চাকরিতে বই পড়া নিষিদ্ধ নয়। মাঝে মাঝে একেবারে বসে থাকতে হয় চুপচাপ।

একটু পড়তে গিয়েই মন জুড়ে এলো নীলার মুখ। এই নীলা আসল নীলা নয়। কেন যেন মনে হচ্ছে, সেই নীল শাড়ি পড়া মেয়েটি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। আর দেখা পাবো না তার। সামান্য একটা ঝড় সহ্য করতে পারিনি আমি।

গতকাল সন্ধেবেলাতেও একবালপুর-খিদিরপুরের সেই খালের ধারে বসেছিলুম অনেকক্ষণ। সেখানে নৌকোটা ছিল না। এক সময় আমার মাথা ব্যথা করছিল খুব। তবু নীলা আসেনি।

হঠাৎ হঠাৎ চমকে জানলার দিকে তাকাই। না, কেউ নেই। জলাভূমির ওপরের আকাশ আজ পরিষ্কার নীল।

দুপুরের দিকে সিঁড়িতে জুতোর ধুপধাপ শব্দ তুলে এসে সহদেব পাল ঢুকলো আমার ঘরে। প্রথমে স্যালুট দিয়ে, খুব দুর্বোধ্য হিন্দীতে বেশ জোরগলায় কিছু একটা বললো।

তারপর দরজাটায় ছিটকিনি দিয়ে, জানলার পর্দাগুলো টেনে খুলে ফেললো মাথার চুল, গোঁফ।

একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বললো, উফ, এই রোদ্দুরে আর পারা যায় না! আজ একেবারে ডাকাতের মতন রোদ উঠেছে। আর কয়েকটা দিন কেটে গেলে বাঁচি।

আমি বললুম, আপনি কবে ট্রান্সফার হচ্ছেন আবার?

সহদেব পাল বললো, দারোয়ান সেজে থাকা কি পোষায়! আর চারদিন পরেই ছুটিতে যাচ্ছি কালিম্পং। সেখান থেকে একেবারে ফ্রেস হয়ে এসে সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে জয়েন করবো কলকাতার অফিসে।

—বাঃ, কালিম্পং খুব ভালো জায়গা। ওখান থেকে লাভা ঘুরে আসবেন। লুলেগাঁও-তে ভালো বাংলো আছে।

—আরে ধুর মশাই! আমি অত বেড়াবার লাইনে নেই। কালিম্পং-এ

কম্পানির রেস্ট হাউস আছে, সেখানে গিয়ে বডি ফেলবো আর শুধু ঘুমোবো। বেস্পতিবার আগুনটা ঠিকমতন লাগাতে পারলেই কম্পানি আমাকে কালিম্পং ট্রিপটা রিওয়ার্ড দেবে।

—আগুন লাগাতেই হবে ?

—সে নিয়ে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। গোডাউনের তিনজনকে কনফিডেন্সে নিতেই হয়েছে। এতগুলো ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া ওষুধ, তার একটা হিল্লে করতে হবে না ? ইনসিওরেন্স থেকে যারা ইন্সপেকশানে আসবে, তাদেরও ম্যানেজ করে ফেলেছি। তবু আগুনটা কনভিনসিং হওয়া দরকার। যাতে খবরের কাগজে ওঠে।

—আপনি তো খুব করিৎকর্মা লোক !

—কম্পানি কি আর এমনি এমনি রেখেছে ! শুনুন মশাই, যেজন্য আপনার কাছে এলুম। আমি সব খবর রাখি তো, এখানকার সব স্টাফ যে আপনার ওপর খুব খাপচুরিয়াস হয়ে আছে !

—কেন ? আমি কী দোষ করেছি ? কারুর ব্যবহারেও তো বোঝা যায় না !

—ব্যবহারে বুঝতে দেবে কেন ? আপনার নামে সবাই মিলে পিটিশন করবে শোনা যাচ্ছে। আপনি নাকি কয়েকজনের নামে চুকলি কেটেছেন বড সাহেবদের কাছে !

—সে আবার কি ? চুকলি কাটবো কেন ?

—ঐ যে গ্যাডগিল, সে আপনার এখানে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে গেল সেদিন, আপনার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করেছে, আসল ইন্‌স্‌পেকশান তো প্রায় কিছুই করলো না। কিন্তু সে আজ গো-ডাউন স্টাফদের মধ্য থেকে তিনজনকে ডেকে পাঠিয়েছে তার হোটেলে। অটোমেটিক্যালি আপনার ওপর সন্দেহ পড়বেই। আপনি তাদের নামে কিছু কমপ্লেইন, তাই গ্যাডগিল ডেকেছে। নইলে গ্যাডগিলের তো ঐসব স্টাফদের নাম জানারই কথা নয় !

—আমি কমপ্লেইন করলেই বা গ্যাডগিল শুনবেন কেন ? আমি তো একটা চুনো পুঁটি !

—আপনি গ্যাডগিলের মেয়েকে বিয়ে করছেন। গ্যাডগিল আপনার মতনই একজন ওয়াচম্যান ছিলেন, তাঁকে দেখে কম্পানির মালিকের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, মালিকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতেই গ্যাডগিলের এখন এত রবরবা।

—এ গল্প আপনি জানলেন কী করে ? আপনি তো তখন এ ঘরে ছিলেন না !

—এসব কথা হাওয়াতে ভেসে বেড়ায় ! বুঝলেন, হাওয়াতে ভাসে ! স্টোরের লোকরা এখন এই আলোচনাই করছে।

—আপনি স্টোরের লোকদের গিয়ে বলুন, ওরা যেন আগে গ্যাডগিলের আর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে !

একটু থমকে গিয়ে, পরে হেসে ফেলে সহদেব বললো, ও, এই ব্যাপার ! গ্যাডগিলের মেয়ে নেই ? সে যাই হোক, আপনার ওপর সবাই কিন্তু খাপ্পা হয়ে আছে বেশ !

—আমি কী দোষ করেছি জানি না। আপনি বলছেন সবাই খাপ্পা, তার মানে কি আপনিও, সহদেববাবু ?

—তা খানিকটা বলতে পাবেন। আপনি আমার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করলেন না। আর মাত্র চারদিন আছে, আমি খালি হাতে চলে যাবো ?

—আপনি যে বললেন, কম্পানি আপনাকে রিওয়ার্ড দেবে ?

—সে কম্পানি যা দেবার দেবে। কিন্তু এখান থেকে কিছু পাবো না ! এ জায়গা যে মশাই সোনার খনি ! শুনুন, নীললোহিতবাবু, আপনি আর আমি কম্পানির কলকাতার মেইন অফিসের লোক। আমাদের রাখা হয়েছে করাপশান চেক করবার জন্য। ঠিক তো ? বেশ, আমরা কম্পানির স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখবো। বাট, আপটু অ্যান এক্সটেণ্ট ! তা বলে কি আমরা নিজেদের স্বার্থ একেবারেই দেখবো না ?

—নিজেদের স্বার্থ ? শুধু স্বার্থ বললেই বোধহয় চলে !

—আর ধুর মশাই ! আপনি আবার এর মধ্যে ব্যাকরণ ফ্যাকরণ টেনে আনছেন কেন ? বলি, বাইরের সাপ্লায়াররা নানা রকম গিফ্‌ট নিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি কাজ আদায় করতে গেলে এগুলো করতে হয়। সারা দেশেই চলে। কার্টন কার্টন ফরেন সিগারেট, হুইস্কি, লাইফ সেভিং ড্রাগ, হরলিক্স, এটা, সেটা ! এগুলো যদি তারা দিতে চায়, লোকে নেবে না ? জলে ফেলে দেবে ?

আমি চমকে উঠে বললুম, না, না, জলে ফেলে দেবে কেন ? এরকম সব দামি জিনিস ?

সহদেব চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সব খবর রাখি। দ্যাজ ইজ মাই ডিউটি ! আপনি ফেলে দিয়েছেন। আপনি ফেলে দিলে অন্যরাও খোলা মনে কিছু নিতে পারে না।

—কেন, আমি তো কারুকে বাধা দিই না ! নিক না, যার যা খুশী !

—আপনি যদি কিছু না নেন, তা হলেই আপনি সাসপেক্ট। আপনি চুকলিখোর। আমিও কিছু নিতে পারছি না। আমরা এক পালকের পাখি। আপনি যদি সাধু সেজে থাকেন, তা হলে আমিও ফাঁক পড়ে যাই। আমি তো আর দারোয়ানদের কাছে ভাগ বসাতে পারি না। দ্যাট ইজ বিনিথ মাই ডিগনিটি!

আমি সহদেব পালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। আর কোনো কথা আমার মুখে এলো না।

সহদেব আমার চোখের সামনে শাসানির আঙুল তুলে বললো, আর একটা কথা।

আজকাল শুধু মাসমাইনের টাকায় ক'জনের সংসার চলে? কিছু উপরি দরকার সকলেরই। এমন কি রাজীব গান্ধীরও। শুধু শুধু এখানকার গরিব বেচারাদের ওপর চোখ রাঙিয়ে কী হবে? আমরা কম্পানির স্বার্থ দেখছি ঠিকই, কিন্তু বাইরের সাপ্লায়াররা শুধু যদি তাড়াতাড়ি কাজ আদায় করার জন্য দু হাজার পাঁচ হাজার দিতে রাজি থাকে, তা হলে সেটা নিতে আপত্তি কিসের? কম্পানির টাকা নয়, কম্পানির কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না, দিচ্ছে বাইরের পার্টি! সেটা সবাই ভাগ করে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? কী, উত্তর দিচ্ছেন না যে? বলুন বলুন, চুপ করে রইলেন কেন? আমি মশাই খোলাখুলি কথা বলি। আপনার কি জবাব আছে বলুন।

আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলুম, মহাভারত শুদ্ধ রাখার দায়িত্ব আসলে তো কেউ দেয়নি!

—তবে? আপনি এত আলগা আলগা ভাব করে থাকছেন কেন? আপনি একটা শেয়ার নিন, তা হলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। অফিসে কাজ করতে গেলে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। অন্য সবাই এক রকম আর আপনি আলাদা সাধু সেজে থাকবেন, এ কখনো হয়? একবার চুঁচড়োর একটা ফ্যাক্টরিতে কী হয়েছিল জানেন? সেখানে আপনার মতন· ·

সহদেব পালের কথা শেষ হলো না। গেটের কাছে একটা ট্রাক ঢোকার আওয়াজ পাওয়া গেল। সহদেব উঠে গিয়ে ওদিককার জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বললো, বাইরের একটা পার্টি ডেলিভারি নিতে এসেছে। বড় পার্টি। আমাকে তো তা হলে যেতে হচ্ছে এখন!

দরজার ছিটকিনি খুলে সহদেব বাইরে পা বাড়াতেই আমি তাকে ডেকে

বললুম, ও সহদেববাবু, আপনি আপনার চুল আর গোঁফ ফেলে যাচ্ছেন যে !

সহদেব চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এত স্মার্ট মানুষটা বিহ্বলভাবে বললো, অ্যাঁ ! চুল আর গোঁফ···সর্বনাশ হয়ে যেত, ধরা পড়ে যেতুম। সব প্ল্যান বানচাল হয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে।

টেবিল থেকে নকল জিনিস দুটো তুলে সে খুব সাবধানে পরে নিল। তারপর আমার দিকে একটা বিচিত্র দৃষ্টি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগলুম।

মিঃ গ্যাডগিল আমার পিঠ চাপড়ে গিয়ে আমার দারুণ ক্ষতি করে গেছেন। কেন, অন্য আরও কত লোকেরই তো পিঠ আছে, তিনি সেগুলো চাপড়াতে পারতেন না ? উনি একসময় ওয়াচম্যানের কাজ করতেন বলে এই ঘরে এসে ওঁর স্মৃতি উথলে উঠেছিল, সেটা কি আমার দোষ ?

আমাকে বলে কিনা চুকলিখোর ! এরকম খারাপ কথা একজন মানুষ সম্পর্কে অন্য কেউ এমন অবলীলাক্রমে বলতে পারে ? গ্যাডগিল এখানে ঘুরে যাবার পর কয়েকদিনের জন্য শিলং গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছেন। এইটুকু আমি শুনেছি মাত্র। আর তাঁকে চোখে দেখিনি। তিনি যদি এখানকার কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই সেদিন হাজিরাখাতা উল্টেপাল্টে দেখে নিজেই কিছু সন্দেহ করেছেন।

আমি এই ক'দিন আর কারুর টিকিটে দাগ দিইনি। আসা যাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করি না, তবু আমার ওপরে রাগ কেন এদের ? আমি জিনিসপত্র কিছু নিই না ঠিকই। আমি নির্লোভ, সাধুপুরুষ নই। কিন্তু যখনই এখানকার কেউ কেউ আমাকে এটা-সেটা দিতে আসে, তখনই মনে হয়, এরা আমাকে একটা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি যে আসলে ভীতু, সেটা এরা বোঝে না।

যে-সব পার্টি এখান থেকে ওষুধ ডেলিভারি নিতে আসে, তারা নানারকম উপহারদ্রব্য নিয়ে আসে, এটা আমি দেখেছি। টাকা-পয়সা কত লেনদেন হয় তা আমি জানি না। পার্টিগুলোর এখানকার কর্মচারিদের খাতির করার কারণটা অতি সরল। অতি প্রয়োজনীয় কোনো ওষুধ কেউ নিতে এলো, এখানকার মিথিলাবাবুর মতন কোনো স্টোর-ইনচার্জ অম্লান বদনে বলে দেবে, ঐ জিনিস তো স্টকে নেই। আজ পাবেন না, পরশু আসবেন। দু দিন দেরিতে অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তখন হুইস্কির বোতল, বিলিতি সিগারেট আরও নানান জিনিস দিলেই দেখা যায় স্টকে আছে যথেষ্টই। এটাই রেওয়াজ হয়ে গেছে। সব

সময় স্টকে নেই বলতেও হয় না, আগে উপহার, তারপর ডেলিভারি। অনেক কম্পানি অফিসিয়াল গিফট হিসেবেই ঘড়ি, রেডিও, লাইটার ইত্যাদি দেয়।

বিনা পয়সায় এসব জিনিস পেতে সবাই ভালোবাসে। উপহার পেতে কার না লোভ হয়! এই যে মেজমামার আনা উপহার তা নিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, আমার বৌদি, মা, সবাই লোভ করেনি? আমিও শুধু লাইটার পেয়ে নিরাশ হইনি? মনে মনে আমার ইচ্ছে ছিল না আরও কিছু পাওয়ার?

এই গুদামে আগে কোনো ওয়াচম্যান ছিল না। নিজেরাই কাজ চালাতো। তাতে তো কম্পানি ফেল পড়েনি, সব কিছুই তো ঠিকঠাক চলছিল। আমাকে এখানে এনে বসানোটা এখানকার কেউ পছন্দ করছে না! আমি যেন একটা ফোঁপরদালাল!

লাখ লাখ বেকারের মধ্যে একজন কেউ চাকরি পেয়ে গেলে অন্য বেকাররা ক্ষুব্ধ হতে পারে। আবার দেখা যাচ্ছে, যারা চাকরি করতে করতে ঝানু হয়ে গেছে, তারাও নতুন কেউ চাকরিতে জয়েন করলে তাকে সহজে মেনে নিতে চায় না। এরা আমার পোস্টটাকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করছে।

নিজের মামার কাছ থেকে কিছু জিনিস নেওয়া আর অচেনা কোনো পার্টির কাছ থেকে জিনিসপত্র নেওয়া কি এক? নিজের পয়সা দিয়ে রোজ সিগারেট কিনতে হয়, এখানে ফাইভ ফিফটি ফাইভের ছড়াছড়ি, এক এক সময় কি আমার ইচ্ছে হয় না দু'এক প্যাকেট নিই?

কিন্তু ভয় হয়। সিগারেট নিলেই মদ, ঘড়ি, রেডিও নিতে হবে। হরলিক্স, ওষুধ, কেক-পেস্ট্রি। তারপর টাকা। সেটাই বা অস্বীকার করব কী করে? এইসব নিলেই ওদের দলে ভিড়ে যেতে হবে। চাকরির দড়ি আমাকে বেঁধে ফেলবে আষ্টেপৃষ্ঠে। আমাকে আর পালাতে দেবে না।

নীলার সঙ্গে আর কোনোদিন যেতে পারবো না দিকশূন্যপুরে? খুঁজে পাব না সেই পথ?

খানিকবাদে সহদেব পাল আবার ফিরে এল।

এবার আর গোঁফ-চুল খুললো না, আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অস্বস্তিকর নীরবতা।

তারপর গম্ভীরভাবে বললো, নীললোহিতবাবু, তখন আপনি আমার চুল আর গোঁফের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অশেষ উপকার করেছেন। এমন একটা পার্টি এসেছিল, যারা আমার আসল চেহারাটা চেনে, যদি দেখত আমি দারোয়ানের

:পোশাকে আছি, তাহলে···। আপনি তো এটা না করলেও পারতেন!

আমি চুপ করে রইলুম। আমি কি এসব ভেবেছি নাকি? চোখ পড়েছে, তাই বলেছি!

সহদেব বলল, এজন্য আপনারও একটা উপকার আমার করা উচিত। বেশি সময় নেই, আপনাকে একটা খবর জানিয়ে যাচ্ছি শুধু। মিথিলাবাবু আর কয়েকজন মিলে ঠিক করেছে, আপনাকে একটু রগড়াবে। আপনি মিথিলাকে ওর দ্বিতীয় বউয়ের সঙ্গে দুপুরবেলা দেখা করতে যেতে দেন না, সেইজন্য ওর খুব রাগ!

—আমি যেতে দেব না কেন? গেলেই পারেন!

—আপনি খাতায় রেকর্ড করেছেন!

—উনি তো আমায় আগে কিছু বলেননি। রগড়াবে মানে কী? মারবে? মেরে ফেলবে?

—খুন? না, না, খুনটুন করবে না। আপনাকে মারলে সেটা তো আর পলিটিক্যাল মার্ডার বলে চালানো যাবে না! বউ খুন ছাড়া আজকাল আর কেউ নন-পলিটিক্যাল মার্ডারের ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় না। যতদূর মনে হচ্ছে, যেদিন আগুন লাগানো হবে, সেদিন আপনাকে একটু ঝলসে দেবে!

—একটু?

—একটু না বেশি, সেটা ঠিক বলা যায় না এখন।

—আমি একটুও আগুনের ছ্যাঁকা সহ্য করতে পারি না। আমার ভীষণ লাগে!

—আগুনের ছ্যাঁকায় সবারই লাগে। একবার চুঁচড়োর এক কারখানায় আপনারই মতন একজনকে একটুখানি রগড়াতে গিয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। সে লোকটার একটা চোখই কানা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, এই ঘরের খাতাপত্তর সব পোড়াবে, সেইসঙ্গে আপনাকেও···আপনি সাবধানে থাকবেন···আমি চেষ্টা করব আপনাকে বাঁচাবার, তবু বলা তো যায় না, দৈবের কথা কে বলতে পারে? আমি যাই এখন···।

আমি টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে চোখ বুঁজলুম। এরা কি আমাকে পয়লা তারিখ পর্যন্তও কাজ করতে দেবে না? অন্তত এক মাসের মাইনেটাও পাবো না? মা, বৌদি কত আশা করে আছে, মাসের প্রথমে আমি তাদের হাতে তিন হাজার টাকা তুলে দেব! মেজমামা লোকজন খাওয়াবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন···।

এরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারপর ভেতরে পেট্রোল ছুঁড়ে

আগুন লাগাবে এই ঘরে। চিকেন রোস্টের মতন ঝলসাবে আমাকে, আমি আর্তনাদ করব, দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা মারব জ্বলন্ত শরীরে, বাইরে থেকে মিথিলা বলবে, আর একটু, আর একটু পুড়ুক, এখন দরজা খুল না, পল্টু…।

আমি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম, মাত্র এক মাসের জন্য কষ্ট কর, নীললোহিত। এক মাস কষ্ট করে মা-দাদা-বৌদি মেজমামাকে খুশি কর। তারপরেই দেশান্তরী হব। কিন্তু সেই এক মাসও আমাকে সহ্য করতে পারলো না এই লোকগুলো? বৌদির কাছে ধার, সিগারেট-দোকানদারের কাছে ধার, বাজারে আলুওয়ালার কাছে ধার, সে সব কিছুই শোধ করা যাবে না।

আমার পিঠে কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই আমি কেঁপে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, নীলা।

নীলা বলল, শিগগির ওঠ, ছাখ, ঝড় আসছে!

আমি বললুম, ঝড?

নীলা বলল, ছাখ, আকাশ ছাখ!

আমি বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সকালবেলা আকাশ নীল ছিল, এখন সত্যিই কালো হয়ে এসেছে। ব্যস্তভাবে ওড়াউড়ি করছে একঝাঁক চিল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে?

নীলা বলল, আমি তোমার কাছে কিছুতেই আসতে পারছিলুম না। বার বার বাধা পড়ছিল।

—কিসের বাধা?

—জানি না। আমার শরীর কাচ হয়ে যাচ্ছিল। তুমি আমাকে সেদিন ছেড়ে চলে গেলে!

—ঝড়ের জন্য ধরে রাখতে পারিনি। আর কি আমি কোনোদিন তোমার দিকশূন্যপুরে যেতে পারব না?

—সেই জন্যই তো আমি এসেছি। এক্ষুনি চল।

--আবার ঝড় উঠছে। তোমাকে দেখতে পাব না।

—ঝড়ের আগেই পৌঁছে যেতে হবে। আজ আমার হাত কিছুতেই ছেড় না তুমি!

উঠে দাঁড়িয়ে নীলার হাত চেপে ধরে বললুম, ছাড়ব না। চলো।

সিঁড়িতে পা দিয়ে আবার বললুম, গেট দিয়ে বেরুতে গেলে তোমাকে সবাই দেখবে। দেখুক। আমি গ্রাহ্য করি না।

নীলা বলল, এই পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট্ট দরজা আছে, জলার দিকে।

—তাই নাকি? আমি তো আগে দেখিনি!

—আমি তো সেই দরজা দিয়েই এলুম। খোলা রেখে এসেছি।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমরা দেয়াল ঘেঁষে ছুটতে লাগলুম।

সত্যিই একটা ছোট দরজা রয়েছে। সেটা দিয়ে বাইরে বেরুতেই জলাভূমি। বড় বড় ঘাস, প্যাচপেচে কাদা। আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় ব্যাঙ ডাকতে শুরু করেছে। দূরে যে লোকগুলো কচুরিপানা সাফ করছিল, তারা এখন নেই।

—নীলা, তোমার পায়ে কাদা লাগছে। এখানে সাপখোপ থাকতে পারে।

—তুমি শুধু আমার হাত ধরে থাক।

—এখান দিয়ে আমরা যাব কী করে? এখানে তো নৌকো নেই!

—আছে, নৌকো আছে, আর একটু চলো।

—কিন্তু এই দমদম থেকে আমরা দিকশূন্যপুরে যাব কী করে? অনেক দুর না?

—যে-কোনো জায়গা দিয়েই দিকশূন্যপুর পৌঁছনো যায়। দিকশূন্যপুরকে কাছেও আনা যায়, তাই না?

—এটা আমি জানতুম না।

জলের পাশ দিয়ে দিয়ে, বড বড বিন্নি ঘাস আর নলখাগড়ার ঝোপ ভেদ করে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলুম, একটা লোক জলে ছিপ ফেলে চুপ করে বসে আছে। আমাদের দেখে সে চমকে উঠল।

নীলা তাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, এখানে একটা নৌকো ছিল না?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, দিদি, ছিল তো। ঐ যে দেখুন, ভেসে গিয়ে একটা দামে আটকে গেছে।

নীলা আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি জলে নেমে নৌকোটা নিয়ে আসতে পারবে?

আমি বললুম, নিশ্চয়ই।

লোকটি বললো, আপনি জলে নামছেন কেন? আমার গা ভিজে। আমি এনে দিচ্ছি।

সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গেল, নিয়ে এল নৌকোটা আমাদের কাছে।

নীলা বলল, আপনি খুব ভাল লোক। দ্যাখ, নীললোহিত, পৃথিবীতে এখনও কত ভালমানুষ আছে। এমনি এমনি অন্যের জন্য নৌকো এনে দেয়।

লোকটি লজ্জা পেয়ে বললো, আপনারা যাবেন তো উঠে পড়ুন। ঝড় এসে যাবে।

আমি সাবধানে নীলাকে বসালুম নৌকোর মাঝখানে। একটা বৈঠা তুলে নিয়ে লোকটিকে বললুম, তুমি আমাদের উপকার করলে, তোমার সব কিছু ভাল হোক।

খানিকটা যেতে না যেতেই ঝড় উঠলো।

আমার দু হাতে বৈঠা। আমি বললুম, নীলা, তুমি আরও কাছে সরে এসো, আমার হাঁটু চেপে ধরে থাকো। নৌকো উল্টোলেও ভয় নেই।

নীলা আমার বুকের ওপর এসে, দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমাকে এবার কিছুতেই ছাড়বো না।

আমি পেছন ফিরে একবার আমাদের গোডাউনটার দিকে তাকালুম।

ঝড়ের জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। মনে হল, ওখানে আসলে কোন গুদাম ছিল না। ওটা অলীক। আমার চাকরিটাও অলীক। এই কচুরিপানায় ভর্তি জলা, এই নৌকো, এই ঝড়, আমার বুকের ওপর নীলা, এই কয়েকটি শুধু বাস্তব।

ঝড়ের ধাক্কায় নৌকোটা দুলছে। কিন্তু নৌকো চালানো সম্পর্কে আমার প্রবল আত্মবিশ্বাস আছে। আমি সুন্দরবনের দুর্দান্ত নদীতেও ঝড়ের মধ্যে নৌকো চালিয়েছি।

বাতাসও এখন কালো। কোনোদিকেই কিছু দেখা যায় না। সেদিনের কুয়াশার মতন। তাহলে এবার দিকশূন্যপুরে ঠিকই পৌঁছনো যাবে।

আমার বুকের ওপর মাথা রেখে যেন নীলা সেই কথাটা শুনতে পেল। মুখ তুলে বলল, এই তো আমরা এসে গেছি।

একবার বিদ্যুৎচমকে চোখে পড়লো, কাছেই একটা বেশ তকতকে ঘাট বাঁধানো। নৌকোটা ভেড়ালুম সেখানে।

নীলা উঠে দাঁড়াতেই নৌকোটা দুলে উঠলো, আমি বললুম, সাবধান!

আমি আগে লাফিয়ে নেমে পড়লুম মাটিতে। পাকা মাঝিদের মতন নৌকোটা টেনে পাড়ের ওপর খানিকটা তুলে এনে তারপর নীলার হাত ধরে নিয়ে এলুম ওপরে।

ঝড় কমেছে, এবার বৃষ্টি।

বৃষ্টির মধ্যে তবু কিছু কিছু দেখা যায়। গালিচার মতন সবুজ ঘাস, ছোট ছোট

অচেনা গাছ। পায়ে চলা রাস্তায় নুড়ি ছড়ানো। নীলা ভিজে একেবারে শপশপে হয়ে গেছে। আমি নিজের ভেজা শরীর দেখতে পাচ্ছি না, নীলাকেই দেখছি। মোটেই হেমেন মজুমদারের ছবির মতন নয় সে, তার নীল শাড়ি ভেদ করে শরীর ফুটে ওঠেনি, মনে হচ্ছে তার কোনো শাড়িই নেই, তার অস্তিত্বটাই নীল। প্রাচীন গ্রীস ভাস্করদের বানানো একটা নীল মূর্তি।

একটা বড় গাছের দিকে হাত দেখিয়ে নীলা বললো, এটা চিনতে পার?

আমি গাছটার গায়ে হাত রেখে কোনো চেনা সাড়া পেলুম না।

নীলা বলল, এটা সেদিনের সেই চাঁপা গাছটা। উর্বশী চাঁপা। এখান থেকে তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে।

আমি নীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললুম, তোমাকে আর এক মিনিটের জন্যও আমি ছেড়ে থাকতে পারবো না।

নীলা বললো, তোমাকে ছেড়ে থাকলে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাই। আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি আর ফিরে যেও না, নীললোহিত।

আমি বললুম, কোথায় যাব? আর সব কিছুই মিথ্যে হয়ে গেছে। কলকাতা শহরটাই তো অবাস্তব। আমাকে এখানে তোমার কাছে থাকতে দেবে?

নীলা বললো, তুমি আমার কাছে থাকো। আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো। আমরা খুব ভালোবাসব। এই গাছটা ধরে ঝাঁকাও তো। যদি দু-একটা ফুল পড়ে, ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজাবো।

—আমার গাছের ফুল দরকার নেই। সেদিন তোমার মুখে আমি চাঁপা ফুলের গন্ধ পেয়েছিলাম। নীলা, সত্যি তুমি আকাশ থেকে শুধু আমারই জন্য এসেছো এই পৃথিবীতে? গ্রহ-গ্রহান্তর পেরিয়ে, মহাশূন্যের কোন এক বিন্দু থেকে··

—তুমিই আমাকে এনেছো। অন্য কেউ তো আমায় আনেনি।

—আমার চিন্তার তরঙ্গ অতদূর পৌঁছয়? সেই জন্যই আমার মাথায় চিড়িক চিড়িক করে ব্যথা হত। অন্য কোন তরঙ্গের সাড়া পেতুম? কিন্তু তোমার এই রূপ, এটা তোমারই তো নিজস্ব? আমি তো এ রূপ কল্পনা করিনি!

—আমার কোন রূপই নেই, নীললোহিত।

আমি নীলার চিবুকে, বুকে হাত বুলিয়ে বললুম, এই যে তোমার শরীর?

নীলা বললো, এই সবই তোমার।

আমি বললুম, নীলা, কী করে আমার এত সৌভাগ্য হল? কী এমন ভাল কাজ করেছি জীবনে?

নীলা বলল, এটা আমারই সৌভাগ্য। তুমি আমার উপহার। চল, আর বৃষ্টিতে ভেজা যাচ্ছে না। আমার ঘরে গিয়ে বসি।

—এখানে তোমার ঘর আছে?

—বাঃ, ঘর থাকবে না? তোমার সেই দিকশূন্যপুরে বন্দনাদি, কৃষ্ণা, ওদের নিজস্ব ঘর ছিল না? কতরকম ফুল দিয়ে আমার ঘর সাজাই। সেদিন তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো বলেছিলুম। এবার সেটা দেখবে আমার ঘরে।

দুই লঘু বালক-বালিকার মতন হাতে হাত ধরে ছুটতে লাগলুম আমরা।

বৃষ্টির জন্য অন্য বাড়িঘর কিছু চোখে পড়ছে না; কিন্তু সরু পথটা আমাদের নিয়ে এল জলের ধারে একটি বাড়ির কাছে। একটিই মাত্র ঘর, পাথরের দেওয়াল, ওপরে খড়ের ছাউনি। সামনে একচিলতে বারান্দা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টির ছাঁটে পায়ের কাদা ধুয়ে নিলুম আগে। নীলা একটা তোয়ালে এনে বললো, ভালো করে মাথা মুছে নাও। এখন আমরা চা খাবো।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েই বুকে যেন বিশাল একটা হাতুড়ির ঘা লাগলো।

দূরের দেওয়ালের দিকে, একটা বেতের চেয়ারে, আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে একজন পুরুষ।

এক লহমার জন্য সেই নিথর মানুষটিকে মনে হয়েছিলো একটা পাথরের মূর্তি, তারপরই বোঝা গেল, না, মানুষ। পেছন ফিরে আছে বলে মুখের একটা পাশ শুধু দেখতে পাচ্ছি, মনে হয়, আমারই কাছাকাছি বয়েসের কোনো যুবক, প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা, পায়ে চটি, এক হাতেব ওপর চিবুকটা রাখা।

নীলা তা হলে একা থাকে না? তার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে? শুধু আমারই জন্য সে শূন্য থেকে নেমে এসেছে বলেছিল, তা আসলে সত্যি নয়? এই ছোকরাটি ওর বডিগার্ড? এর সঙ্গে একঘরে থাকে? আমার প্রতি যে এত ভালোবাসা, তা আসলে ছলনা? কিংবা অন্য কোনো জগৎ থেকে এসে এই মেয়েটি আমার ওপর কোনো এক্সপেরিমেণ্ট করছে?

ঈর্ষায়, রাগে বুকটা ফেটে যেতে চাইছে। আর সব কিছুই আমি ছাড়তে পারতুম, কিন্তু নীলাকেও ছাড়তে হবে? তা হলে যে আমার কিছুই রইল না।

নীলা আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে খেলা করবার জন্য?

এই যুবকের হাতে নীলাকে সঁপে দেবার বদলে নীলাকে ধ্বংস করে দেওয়াও ভাল?

নীলা জিজ্ঞেস করল, ওকে চিনতে পারছো ?

আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। নীলা আমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবে বলেছিল। একি নিষ্ঠুর কৌতুক ওর!

নীলা বেতের চেয়ারটির কাছে গিয়ে যুবকটির কাঁধে হাত দিয়ে খুব আদর করা গলায় বলল, এই, মুখ ফেরাও! দ্যাখ, কে এসেছে!

আমার ইচ্ছে হল ছুটে চলে যেতে। কিন্তু দুঃখের চেয়ে রাগটা প্রবল হয়ে উঠছে, সব কিছু ভেঙে না দিয়ে আমি যেতে পারবো না।

যুবকটি মুখ ফিরিয়ে বলল, ও, আপনি ? নমস্কার!

আমি তার প্রতি উল্টে নমস্কার জানালুম না।

নীলা জিজ্ঞেস করল, তুমি এখনও চিনতে পারছ না একে ?

আমি উত্তর দিলুম না তবু। চিনতে পারিনি, ওকে আমি চিনতে চাই-ও না।

নীলা বললো, তুমি আশ্চর্য মানুষ তো! তুমি একে চিনতে পারছো না, আমার রূপ কেমন হবে তা তুমি জানতে না, তুমি বড্ড ভুলো-মনা, নীললোহিত!

দেওয়াল থেকে একটা আয়না খুলে এনে আমার মুখের সামনে ধরে বলল, এবার নিজেকে দ্যাখো, তারপর ওকে দ্যাখো!

এবার আমি ভূত দেখার মতন কেঁপে উঠলুম। যুবকটিকে হুবহু আমার মতন দেখতে। জামাটা অন্য রকম, চুল আঁচড়ানোটা আলাদা, তা ছাড়া আর কোনো তফাত নেই! ঠিক যেন আমার যমজ ভাই। এ পৃথিবীতে আমার যমজ কেউ নেই, তা আমি খুব ভালোই জানি। অন্য কোথাও ছিল ?

নীলা বললো, ওকে আমি তৈরি করেছি। তুমি যখন কাছে থাকো না, তোমাকে যখন পাই না, তখন আমার খুব কষ্ট হয়। তাই একটু একটু করে বানিয়েছি ওকে। তুমি যেমন আমাকে তৈরি করেছো, তেমনি আমিও তৈরি করেছি তোমাকে!

এতক্ষণ পরে আমি বললুম, সত্যি ? নীলা, তুমি যা বললে, তা সত্যি ?

নীলা বললো, কেন সত্যি হবে না! ঠিক তোমার মতন হয়নি ? এই তিনদিন দেখা পাইনি তোমার, এই তিনদিনে ওকে সম্পূর্ণ করেছি। আজই ও হাঁটতে শিখেছে। দেখবে ? এই, তুমি উঠে একটু হাঁটো তো!

দ্বিতীয় নীললোহিত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটলো কয়েক পা। প্রথমে বাচ্চাদের মতন একটু টলে গেলেও সামলে নিয়ে হেসে বললো, ঠিক পেরে যাব!

ওর গলার আওয়াজ অবিকল আমার মতন।

নীলা বললো, ও কিন্তু ভুলো-মনা নয়। ওকে যা শেখাই সব মনে রাখে।

আমি অভিভূতের মতন জিজ্ঞেস করলুম, আমরা দুজনে এখানে থাকবো ?

নীলা বলল না, তা কি হয়! তুমি এসে গেছো, তুমি আর ফিরে যাবে না তো ?

আমি বললুম, না, নীলা, আমি ফিরে যাবো না। আমি তোমার কাছে থাকতেই এসেছি। কিন্তু ও রাগ করবে না তো ?

নীলা আর দ্বিতীয় নীললোহিত একসঙ্গে হাসলো।

নীলা বললো, ও রাগ করবে কেন ? ও তোমার জায়গায় ফিরে যাবে। ও সব জানে। ওকে কেউ বাজারে ঠকাতে পারবে না। ওকে কেউ অফিসে অপমান করতে পারবে না। কেউ ওকে আগুনে ঝলসে মারতে পারবে না। ও অপরাজেয়।

দ্বিতীয় নীললোহিত একটা হাত তুলে, ভুরু নাচিয়ে হেসে বললো, আমি সব জানি। আমি সব পারবো। এখন যাব ?

আমি তবু অবিশ্বাসের সুরে বললুম, ও রাস্তা চিনে যেতে পারবে ?

দ্বিতীয় নীললোহিত বললো, রাস্তা চেনা তো খুব সহজ। ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টিও নেই।

নীলা তার পিঠে হাত দিয়ে বললো. যাও, তাহলে এগিয়ে পড়, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমাকে দেখে আসবো।

দ্বিতীয় নীললোহিত নেমে পড়লো রাস্তায়, আমি আর নীলা এসে দাঁড়ালুম সরু বারান্দায়।

সে বেশ সাবলীলভাবে হেঁটে যাচ্ছে। একবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে হাত তুললো। তারপর গতি বাড়িয়ে দিল।

অলীক শহর, অলীক চাকরি, অলীক সংসারের দিকে যাচ্ছে একজন অলীক মানুষ। আমার মতন চেহারা হলেও ও আমার মতন নয়, ও সব কিছু সামলাতে পারবে।

আমি আর নীলা 'বারান্দায় হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রইলুম চিরকালের বাস্তব সত্য হয়ে।